জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা

অধ্যাপক গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৮২-৩৮৮০৮৭, ০১৮৭৫-২৪৬৪৫৫
web : www.adhunikprokashoni.com
Email : adhunikprokashoni@yahoo.com
www.facebook.com/adhunikprokashoni

আঃ প্রঃ ৩৫৯

ISBN : 978-984-99187-6-9

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর-২০০৫

১০ম প্রকাশ

রজব	১৪৪৬
পৌষ	১৪৩১
জানুয়ারি	২০২৫

বিনিময় : ১০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

JAMAAT-E-ISLAMIR RAJNOYTIK VUMIKA by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 100.00 Only.

এ বই সম্পর্কে

"জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা" সম্পর্কে বিরোধিরা যেসব অপপ্রচার চালায় তাতে জামায়াতের জনশক্তি যাতে সামান্য বিভ্রান্তও না হয় এবং নিরপেক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বইটি লেখার প্রয়োজনবোধ করেছি।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালে শুরু হবার পূর্বে এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ও চিন্তানায়কের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কীভাবে গড়ে উঠলো সেটাও লেখা আবশ্যক মনে করেছি। জামায়াতে ইসলামী সাধারণ কোনো রাজনৈতিক দল নয়। আধুনিক বিশ্বে নতুন করে আবার ইসলামী সভ্যতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েই মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আবির্ভাব। তাই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা কীভাবে বিকশিত হলো তা তুলে ধরা জরুরি মনে করেছি।

১৯৯২ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা অবস্থায় ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা লেখা হয়। বাকী অংশ ২০০৫ সালে লেখা।

কারাগারে লেখা অংশটি কয়েক বছর আগে স্নেহভাজন মুহাম্মদ কামারুজ্জামান (তৎকালীন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল)-কে পড়ে দেখার জন্য দেই। তিনি লেখার বেশ কিছু অংশ বাদ দেবার প্রস্তাবসহ অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, যার অল্প কিছু বাদে সবই আমি সাদরে গ্রহণ করেছি। তাঁর জন্য আন্তরিক দু'আ রইলো।

আধুনিক প্রকাশনী বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় শুকরিয়া জানাই। খসড়াটি দেখার জন্য অধ্যাপক এ. একে. এম. নাযির আহমদকে দায়িত্ব দেন। তিনি যেসব মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন সেজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

যে উদ্দেশ্যে বইটি রচিত আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করুন এ দু'আ-ই সকলের নিকট কাম্য।

গোলাম আযম

জুন, ২০০৫

সূচীপত্র

প্রাথমিক কথা ---------- ৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ---------- ১০

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ---------- ১১

বিভিন্ন যুগে জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা ---------- ১৩

১৯২৪ থেকে ১৯৩১ ---------- ১৪

- ❖ চিন্তাধারার বিকাশকাল ---------- ১৪

১৯৩২ থেকে ১৯৪১-এর আগস্ট ---------- ১৭

১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ ---------- ২৪

১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর ---------- ২৫

- ❖ আদর্শ প্রস্তাবের দাবি ---------- ২৬
- ❖ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ---------- ২৭

১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৪ ---------- ৩০

- ❖ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ---------- ৩০
- ❖ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৬৫ ---------- ৩৪

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ ---------- ৩৭

- ❖ পি. ডি. এম ---------- ৩৭
- ❖ ডি. এ. সি (DAC) ---------- ৩৮
- ❖ গোল টেবিল বৈঠক ---------- ৩৮
- ❖ গোল টেবিল বৈঠকে সমস্যা ---------- ৪০
- ❖ গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেলো ---------- ৪২
- ❖ এ ব্যর্থতায় শেখ সাহেবের প্রতিক্রিয়া ---------- ৪৩
- ❖ ১৯৭০-এর নির্বাচন ---------- ৪৪
- ❖ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াত বনাম আওয়ামীলীগ ---------- ৪৫

১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর---------------------------------- ৪৭
❖ জামায়াতের নির্বাচনোত্তর পলিসী ---------------------------- ৪৭
❖ নির্বাচনোত্তর সমস্যা -------------------------------------- ৪৮
❖ শেখ মুজিব যা করতে পারতেন--------------------------------- ৫১
❖ ইয়াহ্ইয়া-মুজিব বৈঠক------------------------------------ ৫২
❖ পূর্ব পরিকল্পনাবিহীন আলোচনা------------------------------ ৫৪
❖ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কারা দিয়েছেন? --------------- ৫৬
❖ ১৯৭১-এর সংকট সৃষ্টির জন্য কারা দায়ী? -------------------- ৫৭
❖ ৭১-এর পরিস্থিতি ও জামায়াতের বিশ্লেষণ-------------------- ৫৯
❖ জামায়াতের সামনে ৩টি পথ ছিলো------------------------- ৬২
❖ ১৯৭১-এ যা ঘটেছে ------------------------------------- ৬২
❖ ১৯৭১-এর মানবীয় দিক ---------------------------------- ৬৪
১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সালের মে ---------------------------------- ৬৬
❖ শেখ মুজিব সরকারের আজব সিদ্ধান্ত------------------------ ৬৬
১৯৭৯-এর জুন থেকে ১৯৮২-এর মার্চ------------------------------ ৭০
❖ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সেনাপতির ক্ষমতা দখল------------------ ৭২
মার্চ ১৯৮২ সালের থেকে ১৯৯০-এর ডিসেম্বর---------------------- ৭৫
❖ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন ---------------------------- ৭৯
❖ কেয়ারটেকার সরকার-- ৮০
❖ এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ২য় অবদান-- ৮৪
❖ বাংলাদেশে জামায়াতের নামে প্রথম নির্বাচন ----------------- ৮৪
❖ জামায়াত নিজস্ব ইস্যু ছাড়া অন্য দলের ইস্যুতে কখনো আন্দোলন করে নি -- ৮৫
১৯৯১ থেকে ২০০৫ --- ৮৭
❖ জামায়াতের বিরুদ্ধে নারী নেতৃত্ব সমর্থনের অভিযোগ----------- ৮৭
❖ জোট সরকারে জামায়াতের শামিল হওয়া --------------------- ৮৮
❖ জামায়াত অনিয়মতান্ত্রিক পন্থাকে ইসলামী মনে করে না --------- ৮৯
❖ একবিংশ শতাব্দিতে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মসূচি --- ৯০
❖ ইসলামী ঐক্যের জন্য জামায়াতের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা------------- ৯১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাথমিক কথা

সাধারণত প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সরকারি ক্ষমতা দখল করে দলীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করতে চায়। ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্য ছাড়া রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, ক্ষমতায় যাওয়া আসল উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে এক দলের নেতা নিজের দল ত্যাগ করে ক্ষমতায় যাবার সুযোগ নেওয়ার জন্য আর এক দলে যোগদান করে। এ জাতীয় নেতা ও দলের কোনো আদর্শ নেই। ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করাই তাদের রাজনীতি করার আসল উদ্দেশ্য।

এ জাতীয় আদর্শহীন দল ও নেতৃত্ব কোনো জনপ্রিয় ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে কোনো আদর্শের দোহাই দিলেও ক্ষমতায় যাওয়ার পর আবার সুবিধাবাদী রাজনীতিই করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হলো মুসলিম লীগ। মুসলিম জাতির সত্যিকার স্বাধীনতার জন্য ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে মুসলমানদের আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চাই– এ জনপ্রিয় ইস্যু নিয়ে মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করতে সক্ষম হলো। মুসলিম জাতির বিপুল সমর্থন হাসিল করার জন্য তাদেরকে ইসলামের দোহাই দিতে হলো। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে বলে মুসলিম জাতির মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি হলো। যে এলাকায় পাকিস্তান হবে না বলে জানা ছিলো সেখানকার মুসলমানরাই ইসলামের নামে পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি কুরবানী দিলো। পাকিস্তান কায়েম হয়ে গেলো। মুসলিম লীগ ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করলো।

ক্ষমতায় যাওয়ার পর মুসলিমলীগ নেতৃত্ব ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। ফলে ইসলামী চেতনা ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ দুর্বল হতে থাকলো। ভাষা ও এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তা শূন্যস্থান পূরণ করলো। পরিণামে পাকিস্তান ভেঙে গেলো। পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ নামে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হলো। স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানের স্রষ্টা ও মুসলিম জাতীয়তার প্রবক্তা মুসলিম লীগ বাংলাদেশে জনসমর্থন হারালো।

ক্ষমতার রাজনীতির কেমন পরিণাম হয়ে থাকে এর আর একটি উদাহরণ হলো আওয়ামীলীগ। পাকিস্তান কায়েম হবার অল্পদিন পরই মুসলিম লীগ নেতৃত্বে স্বার্থের ভিত্তিতে কোন্দল সৃষ্টি হলো। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ (জনগণের মুসলিম লীগ) গঠন করা হলো। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেরেবাংলা, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় লাভ করলো। মুসলিম লীগ নির্বাচনে মাত্র ৯টি আসন পেলো। চট্টগ্রামের জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়ে মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার ফলে মোট ১০টি আসন নিয়ে পার্লামেন্টারি পার্টির মর্যাদা পায়। পাকিস্তান কায়েমের ৭ বছর পরই মুসলিম লীগের পতন এসে গেলো। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও শেরেবাংলা ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করলো।

অল্পদিন পরই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলো এবং ক্ষমতার ভারসাম্য প্রাদেশিক পরিষদের ৭২ জন হিন্দু সদস্যের হাতে এসে গেলো। আওয়ামী মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল বলে হিন্দু সদস্যরা শেরেবাংলার দলকে ক্ষমতায় বসালেন। দলের নামে 'মুসলিম' থাকায় সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য আওয়ামীলীগ হিন্দুদের সমর্থন পেলো না। সাম্প্রদায়িকতার বদনাম থেকে বাঁচার জন্য তারা দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিলো এবং ইসলামের বদলে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করে ১৯৫৬ সালে হিন্দু সদস্যদের সমর্থন নিয়ে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় বসলো।

মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগ করে বাঙালী জাতীয়তা গ্রহণ করায় আওয়ামীলীগ গোটা পাকিস্তানে রাজনীতি করার অযোগ্য হয়ে পড়লো। বাঙালী জাতীয়তার আদর্শ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনীতি করার যোগ্যতা হারাবার ফলে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় যাবার প্রয়োজনে পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পথ তালাশ করতে বাধ্য হলো।

১৯৭০-এর নির্বাচনে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী হলেও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনই করতে পারে নি। ভুট্টো নিজের বাদশাহী কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দিলেন। পাকিস্তান এক থাকলে আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন হতো। ভুট্টো কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা পেতেন না। অবশ্য আওয়ামীলীগ চাইলে বিচ্ছিন্নতা ঠেকাতে পারতো। কিন্তু তারা সৎ সাহস দেখাতে ব্যর্থ হলো। পাকিস্তানের চির দুশমন ভারত এ মহা সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যা করণীয় তাই করলো। পরিণামে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার বদলে শুধু বাংলাদেশের নেতা হলেন।

ক্ষমতার রাজনীতি সফল হলো বটে কিন্তু দেশ গড়ার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা না থাকা এবং এ উদ্দেশ্যে লোক তৈরি না করায় গণতন্ত্রটুকুও রক্ষা করতে আওয়ামীলীগ ব্যর্থ হলো। দিল্লী থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মস্কো থেকে সমাজতন্ত্র আমদানী করে ১৯৭২-এর শাসনতন্ত্রে রোপণ করা হলো। কিন্তু জনগণ '৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে তা উপড়িয়ে ফেলে দিলো। এ সত্ত্বেও এ দলটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এখনও আঁকড়ে আছে। দেশ গড়ার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। যাকে এ দলের প্রাণ পুরুষ হিসেবে এখনও শ্রদ্ধা করা হয় তিনি '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত জনগণকে যা দিয়ে গেলেন এর চেয়ে ভালো কিছু দেশবাসী এ দলটি থেকে পাওয়ার আশা করে না।

২৫ জুন-১৯৯২

গোলাম আযম
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার এ লেখাটি ১৯৯২ সালে লেখা। তখন ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা লেখা হয়। বই আকারে পূর্বে লেখাটি প্রকাশিত হয় নি বলে বর্তমান সময়ে (২০০৫) পর্যন্ত জামায়াতের ভূমিকা লিখলাম।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়কে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদেশে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন। ৪ দলীয় জোটের সরকারকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও তালেবান সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করে আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশকেও দখল করার জন্য আমেরিকাকে উসকিয়ে দিচ্ছেন। আর বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতনের মিথ্যা বানোয়াট তথ্য প্রচার করে ভারতকে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। '৭১ সালের মতো আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক শক্তি সুস্পষ্ট দুটো বিপরীতমুখী শিবিরে বিভক্ত। একদিকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ ও ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার শিবির। অপরদিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ভারতের আধিপত্যবাদের কট্টর সমর্থকদের শিবির।

দ্বিতীয় শিবির '৭১ সালের মতো আর একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশী। প্রথম শিবিরের সাথে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ভারতের আধিপত্য কায়েমই তাদের লক্ষ্য বলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা নামে এ পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো যাতে সকল রাজনৈতিক মহল জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ধারণা পোষণ করতে পারেন এবং এ বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ না থাকে।

গোলাম আযম

মে, ২০০৫

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা কেউ সমর্থন করুক বা না করুক, অন্তত নিরপেক্ষভাবে সে ভূমিকাকে বুঝতে হলে এর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-কে সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। তাঁর জ্ঞানের বিশালতা, সাংগঠনিক প্রতিভা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অতুলনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জানার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাতে আমি অভিভূত ও বিস্মিত।

একই ব্যক্তির মধ্যে কোনো আদর্শের চিন্তানায়কের ভূমিকা এবং ঐ চিন্তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। মাওলানা মওদূদী সে উদাহরণই স্থাপন করেছেন।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মাত্র ১৭ বছরের কিশোর মওদূদী জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত 'তাজ' নামক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যে উদ্দেশ্যে কলম ধরেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত ঐ একই মহান উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করে গেছেন। চিন্তার বিকাশ, বিবর্তন ও বিস্তার অবশ্যই তাঁর হয়েছে, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নি।

তাঁর চিন্তাধারা ও তত্ত্ব মোটেই জটিল নয়। তিনি ২৫ বছর বয়স থেকেই যে চিন্তাধারা প্রকাশ করে তা বাস্তবায়নের সংগ্রাম করে গেছেন তার সারকথা হলো :

"এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, বিধানদাতা ও পরিচালক এক আল্লাহ। এ ব্যাপারে আর কেউ শরিক নেই। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল সৃষ্টি বাধ্য হয়ে তারই রচিত বিধান মেনে চলছে। তিনি নিজেই সে বিধান জারি করেন। মানুষের জৈবিক জীবনের বেলায়ও একথা সত্য।"

"কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য যে বিধান তিনি রচনা করেছেন তা তিনি নিজে জারি করেন না। সে বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠান এবং তা মেনে চলা বা না চলার ব্যাপারে তিনি মানুষকে বাধ্য করেন না। এ বিধান মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা এ বিধান মেনে চলতে চেষ্টা করে তারাই মুসলিম (আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পনকারী)।"

"মুসলিম জীবনের প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধানকে মানব সমাজে বিজয়ী করা। সমাজ ও রাষ্ট্র যদি আল্লাহর বিধান মেনে চলে তবেই জনগণের পক্ষে মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা সহজ ও সম্ভব।"

সত্যিকার মুসলিম আল্লাহকে একমাত্র মনিব মেনে তাঁর পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে চলে। আর কোনো শক্তির অধীনতা বরদাশত করা মুসলিমের জন্য মোটেই সাজে না। তাই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম করার জন্য জান ও মাল কুরবান করে জিহাদ করা সব ফরযের বড়ো ফরয। কারণ মানব জাতিকে সবরকম গোলামী থেকে মুক্ত করা মুসলিমদেরই দায়িত্ব। এক আল্লাহর গোলামী স্বীকার করে নিলেই সব রকম গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।"

"এ মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে মযবুতভাবে জামায়াতবদ্ধ হতে হবে। এ জাতীয় সংগঠনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি, কর্মকাণ্ড, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্ব কায়েমের লক্ষ্যেই নিয়োজিত হতে হবে।"

মাওলানা মওদূদী রহ. আজীবন এ নীতির ভিত্তিতেই সবকিছু করেছেন। বৃটিশ শাসনের বিরোধিতা, অমুসলিম প্রধান কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ড ভারতের বিরোধিতা, এমন কি মুসলিম নামধারীদের নেতৃত্বে অনৈসলামী শাসনের সমালোচনা ও সংশোধন প্রচেষ্টা ঐ নীতিরই বাস্তব অনুসরণ। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ঐ নীতি দ্বারাই পরিচালিত। যারা ঐ নীতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখেন তাদের পক্ষে জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা মোটেই জটিল মনে হবে না। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতি যে দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় তার পক্ষে জামায়াতের ভূমিকার তাৎপর্য অনুধাবন করা সত্যিই কঠিন।

বিভিন্ন যুগে জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা স্পষ্টরূপে তুলে ধরার প্রয়োজনে ১৯২৪ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত ৮০ বছরেরও বেশি সময়কে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. ১৯২৪ থেকে ৩১ সাল।

২. ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ সালের আগস্ট।

৩. ১৯৪১ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৭ সাল।

৪. ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর।

৫. ১৯৫৮ সালরর অক্টোবর থেকে ১৯৬৪ সাল।

৬. ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০-এর ডিসেম্বর।

৭. ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর।

৮. ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সালের মে।

৯. ১৯৭৯ সালের জুন থেকে ১৯৮২ সালের মার্চ।

১০. ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর।

১১. ১৯৯১ থেকে ২০০৫।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১-এর আগস্ট মাসে সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতার চিন্তাধারা ১৯২১ সাল থেকেই বিকশিত হতে থাকে। যেহেতু তাঁরই চিন্তাধারার সৃষ্টি হলো জামায়াতে ইসলামী এবং জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণে তাঁরই অবদান সবচেয়ে বেশি; সেহেতু জামায়াত একটি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে ২০ বছর তিনি যা করেছেন তা জামায়াতের ভূমিকারই পটভূমি রচনা করেছে। এখন এক একটি যুগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১৯২৪ থেকে ১৯৩১

চিন্তাধারার বিকাশকাল

মাওলানা মওদূদী মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৯২৫ সালে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপাত্র "আল জমিয়ত"-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ গোটা উপমহাদেশের আলেম সমাজের প্রধান সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (২৮ জুলাই ১৯১৪ - ১১ নভেম্বর ১৯১৮) পর ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ তুর্কী ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হচ্ছে দেখে ভারতের মুসলমানরা খিলাফত রক্ষার পক্ষে যে আন্দোলন করে এর নেতৃত্বে আলেমদের বিরাট ভূমিকা ছিলো। এ খিলাফত আন্দোলন ইংরেজের বিরুদ্ধে ছিলো। গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেস এ আন্দোলনে সহযোগিতা করে আলেমগণের আস্থা অর্জন করে। ১৯২৪ সালেই খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তুর্কী খিলাফতের পতন হয়।

ওলামায়ে হিন্দের মুখপাত্র "আল জমিয়ত" পত্রিকা ইংরেজদের গোলামীর বিরুদ্ধে এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছিলো। খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে কতক হিন্দু ধর্মনেতা মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করেন। "রঙিলা রাসূল" নামক এক বই তারা প্রচার করতে লাগলো। ঐ বইতে রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে চরম অশ্লীল কুৎসা লিখিত ছিলো। কাজী আবদুর রশীদ নামে একজন মুসলমান জিহাদী ফরয আদায়ের দায়িত্ব পালনের ঘোষণা দিয়ে ১৯২৬ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করলো এবং হাসিমুখে শহীদ হবার প্রত্যয় নিয়ে ফাঁসিতে ঝুললো।

এর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় গোটা হিন্দু নেতৃত্ব ইসলাম ও জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালালো। "কুরআন মুসলমানদেরকে হিংস্রতা শিক্ষা দেয়, মুসলিম জাতি বড়ো রক্ত পিপাসু এবং তলোয়ার দিয়ে ইসলাম প্রচার করা হয়" ইত্যাদি প্রচারণা মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করে ফেলে।

মাওলানা মওদূদী "আল জমিয়ত" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ইসলামের জিহাদী চিন্তাধারার উপর তাঁর গবেষণা ২৭ সালের শুরু থেকেই প্রকাশ করতে থাকেন। প্রথম কয়েক কিস্তি বের হবার পর থেকেই কুরআন-হাদীস-ফিকাহর বড়ো বড়ো আলেম তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার উজার করে এ গবেষণাকে সার্থক করার জন্য মাওলানা মওদূদীকে সহায়তা করেন।

১৯২৮ সালে "আল-জিহাদ ফিল ইসলাম" নামে ঐ গবেষণার ফসল বিরাট গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন যে, ঐ গবেষণা-ই তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাধারা নির্মাণ করে দিয়েছে।

আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখতে গিয়ে ইংরেজ থেকে স্বাধীন হওয়ার আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তাদের মতে গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে মিলেই দেশ স্বাধীন করতে হবে এবং হিন্দু-মুসলমান একজাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ না হলে স্বাধীনতা আসবে না।

মাওলানা মওদূদী এ মত কিছুতেই সঠিক বলে মেনে নিতে রাজি হলেন না। মুসলমানগণ একটি আলাদা জাতি হিসেবে ইসলামের বিজয়ের জন্য জিহাদ করাই তাদের দায়িত্ব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন- শুধু ইংরেজ থেকে স্বাধীন হওয়াই যথেষ্ট নয়, কংগ্রেস থেকেও স্বাধীন হতে হবে। নইলে ইংরেজ চলে যাবার পরও মুসলিম জাতি পরাধীনই থেকে যাবে।

পলিসি ও মতামতের এ বিরাট পার্থক্যের কারণে মাওলানা মওদূদী পত্রিকার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন। এরপর তিন বছর তিনি ভূপালের নওয়াবের সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ ইসলামী লাইব্রেরিতে ইসলামের সব দিক সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকলেন। আরবি, উর্দু ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে যেমন অধ্যয়ন করলেন, তেমনি আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর সমাধান কুরআন থেকে পাওয়া যায় কি-না সে বিষয়েও গবেষণা চালালেন। "মেরী মুহসিন কিতাব" নামক এক নিবন্ধে তিনি তার এ গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লিখেন :

"মানব সমাজের সমস্যার বিশ্লেষণ ও এর সমাধান সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাবিদদের লেখা গভীরভাবে অধ্যয়নের দ্বারা আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। তাদের দেওয়া সমাধান কোনোটাই আমার নিকট সন্তোষজনক মনে না হলেও তারা সমস্যাবলির যেসব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তা সমস্যাবলির

গোড়া তালাশ করতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' সম্পর্কে গবেষণাকালে আমার অন্তরে মযবুত বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, আল্লাহর কিতাব মানব সমস্যার সমাধান দেবার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছে। এখন মানব সমস্যা সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা পেলাম এর সমাধান কুরআনে তালাশ করার উদ্দেশ্যে গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করতে লাগলাম।"

"আমি অত্যন্ত বিস্মিত, পুলকিত ও উৎসাহিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, বড়ো বড়ো চিন্তাবিদগণ তাদের দেওয়া সমাধানের ব্যাখ্যায় কতো দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অথচ কুরআন দু'এক কথায় এমন সমাধান দিয়ে রেখেছে যার সাথে আর কারো সমাধানের তুলনা করাই বাতুলতা। একথা আমি অকপটে স্বীকার করি যে, সমস্যা বোঝাবার ব্যাপারে তাদের বিজ্ঞ আলোচনা এবং তাদের সমাধানের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন না করলে কুরআনের দেওয়া সমাধান এতো সহজে আমার বোধগম্য হতো না। তাদের সমাধান যেখানে যেয়ে হোচট খেয়েছে সেখানেই কুরআনে চলার পথ দেখতে পেয়েছি।"

"তাই বিনা দ্বিধায় বলছি যে, কুরআনই আমার 'মুহসিন' পুস্তক যে আমার হাতে শাহে কালীদ (Master Key) তুলে দিয়েছে। এখন মানব সমস্যার যে তালা'তেই এ চাবি লাগাই সে তালা'ই অনায়াসে খুলে যায়।" (মুহসিন মানে যে অনুগ্রহ, উপকার ও দয়া করে।)

[যে নিবন্ধ থেকে এ উদ্ধৃতি দিলাম তা আমার হাতে এখন উপস্থিত নেই বলে ভাষার দিক দিয়ে এ উদ্ধৃতি সঠিক নয়। কিন্তু তাঁর এ লেখা আমাকে এতোটা অভিভূত করেছিলো যে, তাঁর ভাব যে আমি নির্ভুলভাবেই তুলে ধরেছি তা নিশ্চিত করেই বলতে পারি।]

এভাবেই এ শতাব্দির ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রাণ পুরুষের চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে।

১৯৩২ থেকে ১৯৪১ সালের আগস্ট

বিংশ শতাব্দীর প্রধান ইসলামী চিন্তানায়ক হিসেবে যিনি গোটা মুসলিম দুনিয়ায় স্বীকৃত, সে মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর চিন্তাধারাকে পূর্ণরূপে গুছিয়ে নিয়ে তাঁর জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে মাসিক "তরজুমানুল কুরআন" পত্রিকার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করেন। ইসলামী বিপ্লবের যে নীল নকশা তিনি তৈরি করলেন তাতে তিনি চিন্তার বিশুদ্ধিকরণের কাজকেই প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন।

তাঁর এ পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জাতির চিন্তাধারাকে বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে তিনটি কথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে পেশ করেন :

১. প্রথমত ইসলাম আল্লাহর দেওয়া একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য কুরআনের মাধ্যমে যে সঠিক বিধান দেওয়া হয়েছে এর সবটুকুই ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা এ পূর্ণ ইসলাম কবুল করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের কোনো দিক ও বিভাগকে কবুল করতে অস্বীকার করলে আল্লাহর নিকট মুসলিম বলে গণ্য হবে না। সাধারণ মুসলমানদের কথা থাক। আলেম সমাজের মধ্যেও অনেকের কাছেই ইসলাম শুধু একটি ধর্ম হিসেবেই বেঁচে আছে। মানুষের জীবনের ধর্মীয় দিক ছাড়া রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিকে ইসলামী বিধানের চর্চা নেই।

ওলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা রাজনীতি করেন তারা এমন সব রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত যে সবের নেতৃত্ব অমুসলিমদের হাতে অথবা এমন মুসলমানদের হাতে যারা কুরআন ও সুন্নাহর ধার ধারে না। তাদের মধ্যে যারা নামায-রোযা করেন তারাও ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করেন না। দেশ, রাষ্ট্র ও সরকারকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি চর্চা হচ্ছে তাতে আলেম সমাজের অবদান নগণ্য। যেটুকু অবদান তাদের রয়েছে তা নেতৃত্বের পর্যায়ে নয়। তাই রাজনীতিতে ইসলাম অনুপস্থিত।

অর্থনৈতিক ময়দানে গোটা আলেম সমাজই অনুপস্থিত। ইসলামে কোনো অর্থনৈতিক বিধান আছে বলে তাঁদের মধ্যে কোনো ধারণা নেই। ইসলামের বিরাট তামাদ্দুনিক (সাংস্কৃতিক) দিকের কোনো চর্চাই নেই। সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যসূচী সম্পর্কেও আলেম সমাজের কোনো ধারণা নেই।

এভাবে মুসলিম জনগণ ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম বলেই জানে এবং আলেম সমাজকে তাদের শুধু ধর্মীয় নেতা হিসেবেই মানে। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য পরিপূর্ণ একটি বিধান হিসেবে বাস্তবে কায়েম করে রেখে গেছেন এবং সব দিক দিয়েই জনগণের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কিরামের রেখে যাওয়া ঐ পূর্ণ ইসলামকেই জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সচেতনভাবে কবুল করতে হবে।

১৯৩২ সাল থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত তিনি ইসলামকে এভাবেই পেশ করে মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

২. দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর তিনি তাঁর পত্রিকায় জোর দিয়েছেন, তা হলো– বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে চলার গুরুত্ব। ইসলামকে জানা সত্ত্বেও না মানা মুসলিমের পরিচয় বহন করে না। যে কোনো কাফিরও ইসলাম সম্পর্কে ইলম হাসিল করতে পারে। সে এর উপর ঈমান আনে না বলেই তাকে কাফির বলা হয়। যে ঈমান আনে সে মুসলিম। এখন কোনো মুসলিম যদি আমলের ময়দানে কাফিরের মতোই চলে তাহলে মুসলিম দাবি করার অর্থ কী? মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে এবং মুসলমান ধরনের নাম রাখলেই যে মুসলিম হবার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় সে কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে। 'মুসলিম' কথাটি কিছু গুণ বোঝায়। যে ইসলাম কবুল করে সে-ই মুসলিম। মুসলিমের সন্তান হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাকে বুঝে-শুনে ইসলাম কবুল করতে হবে।

কোনো সৈনিকের ছেলে সৈনিকের গুণ অর্জন না করলে তাকে সরকার গদীনশীন সৈনিক বলে স্বীকার করতে পারে না। তেমনি গদীনশীন মুসলমান বলে কোনো পদ আল্লাহর কাছে নেই। নবীর ঘরে সৃষ্টি হলেও কাফির হতে পারে। আবার কাফিরের ঘরে সৃষ্টি হলেও মুসলমান হতে পারে। মুসলমান হওয়াটা জন্মগত কোনো ব্যাপার নয়। ইসলাম গ্রহণ ও পালনের বিষয়, মুসলিম দাবিই যথেষ্ট নয়।

৩. তৃতীয়ত যে বিষয়টিকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জোরালো ভাষায় বারবার পেশ করেছেন তা হলো– মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি মুসলিম উম্মাহকে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী দল বা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ বলে উল্লেখ করে এ দলের কর্তব্য সম্পর্কে বহুভাবে আলোচনা করেছেন।

মানবজাতির নিকট আল্লাহর দীনের আলো বিতরণ করা, মানব সমাজকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলা, মানুষের মনগড়া আইনের কারণে জনগণ যে অশান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে আল্লাহর আইনের অধীনে শান্তিময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি হলো মুসলিম জাতির প্রধান কর্তব্য।

উপর্যুক্ত তিনটি বক্তব্য কুরআন ও হাদীসের দলীল এবং রাসূলুল্লাহ সা., খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ পেশ করে একাধারে ৯টি বছর ওলামায়ে কিরাম ও মুসলিম শিক্ষিত সমাজের চিন্তা-চেতনাকে ইসলামের দৃষ্টিতে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি চিন্তার বিশুদ্ধিকরণের দায়িত্ব পালন করেন। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যেসব কাজ আঞ্জাম দেন সেগুলো হলো:

(ক) মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে ব্যাপক সংশোধনীমূলক দাওয়াতী কাজ করার জন্য ওলামায়ে কিরাম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

(খ) ঐ সময়কার উল্লেখযোগ্য সব রাজনৈতিক দলের আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচির বিশ্লেষণ করে মুসলিমদের রাজনীতির উদ্দেশ্য ও ধরন কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম ভারতের সবচেয়ে বড়ো দল "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" সম্পর্কে বলেন :

"এ দলটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে ভারতের সব ধর্মের লোকদের সমন্বয়ে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। মুসলমানদের জন্য এ দলটি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। এ দলের স্বাধীনতার আবেগময় আহ্বানে সাড়া দিলে মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।"

এ সমালোচনায় মুসলিম নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগ, আল্লামা মাশরেকীর খাকসার পার্টি ও অন্যান্য মুসলিম দল খুব খুশি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এসব দলের বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেন যে, মুসলিম উম্মাহর স্বাধীনতা ও কল্যাণের উপযোগী কর্মসূচি তাদের কাছেও নেই।

মুসলিম লীগের 'টু নেশন থিউরি' (দ্বি-জাতিতত্ত্ব)-কে তিনি মুবারকবাদ জানান। কিন্তু তাদের কর্মসূচি ও নেতৃত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি পরিবর্তন করার পরামর্শ দেন। যদি তা না করা হয় তাহলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক দেশ কায়েম করা সম্ভব হলেও তাদের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মোকাবিলায় মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব মুসলিম জাতির মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করলেও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করায় এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়।

মাওলানা মাদানী ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে লাহোর শাহী মসজিদে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে বক্তৃতায় ইসলামের দোহাই দিয়ে যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেন। এ বক্তৃতাটি "মুত্তাহিদা কাওমিয়্যাত আওর ইসলাম" (যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম) নামে পুস্তিকাকারে প্রচার করা হয়।

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও মুসলমানদের পৃথক জাতীয়তার অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক আল্লামা ইকবাল লাহোরেই ছিলেন। তিনি এ বক্তৃতার রিপোর্ট শুনে আবেগের সাথে তাৎক্ষণিকভাবেই কাব্যের ভাষায় বলে উঠেন :

বুঝেনি ঐ আজমবাসী
দীনের মর্ম বিহ্বলতা,
দেওবন্দে তাইতো হুসেন
আহমদ কন আজব কথা।
"ওয়াতন থেকে মিল্লাত হয়"
এই কথা ফের গান যে তিনি,
বুঝেনি হায় নবীর মুকাম
আল আরাবীর মানে যে তিনি।
নবীর কাছে পৌছিয়ে দাও
নিজেকে–এই দীনের দাবি।
পৌছাতে না পারো যদি
সবই হবে 'বু-লাহাবী'।

(ফারসী ভাষায় কবিতাটি-কবি ফররুখ আহমদের অনুবাদ)

মুসলিম লীগে হয়তো এমন কোনো আলেম ছিলেন না যে, মাওলানা মাদানী রহ.-এর মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের জবাব দিতে পারে। মাওলানা মওদূদী রহ. এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। "মাসয়ালায়ে কাওমিয়্যাত"[১] নামে এর এমন

---

১. বাংলায় এ বইটির নাম "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ"।

মযবুত যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ প্রকাশ করেন যার কোনো জবাব অপর পক্ষ আর দিতে পারেন নি। এ বইটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হবার পর মুসলিম লীগের সকল পর্যায়ের নেতাগণ এর ব্যাপক প্রচার করেন। এমনকি তারা জনসভায় পর্যন্ত পড়ে শোনান। কায়েদ আযমের ঘনিষ্ঠ ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা জাফর আহমদ আনসারীর মুখে আমি নিজে শুনেছি– এ বইটির জনপ্রিয়তার কারণে ১৯৩৮ সালে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়।

স্যার সাইয়েদ আহমদের প্রতিষ্ঠিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো মুসলিম জাতীয়তার প্রধান লালনক্ষেত্র। মাওলানা মওদূদী রহ. ঐ বইটির কারণে সেখানে এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে, ১৯৪০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বক্তৃতামালার অনুষ্ঠানে মাওলানাকে অতিথি বক্তা হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়। তার ঐ বক্তৃতাটি "ইসলামী হুকুমত কিস্‌তারাহ কায়েম হুতী হ্যায়"[২] নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হবার ৬ মাস পর আলীগড়ের ঐ বক্তৃতায় মাওলানা বলেন :

"এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, মুসলমানগণ একটি আলাদা জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারত বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে রাষ্ট্রটি ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত করার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতির প্রস্তুতি প্রয়োজন তার কিছুই করা হচ্ছে না। লেবু গাছে যেমন আম ধরে না, মোটর গাড়ীতে যেমন আমেরিকা যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি এ আন্দোলনের ফলে একটি স্বাধীন দেশ কায়েম হলেও তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে না।" এর পর তিনি ঐ বক্তৃতায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সা. অবলম্বন করেছিলেন এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন।

১৯৫২ সালে রংপুরে তমুদ্দুন মজলিসের দায়িত্ব পালনকালে ইংরেজিতে ঐ বক্তৃতাটি পড়ার সুযোগ পাই। ইংরেজিতে বইটির নাম "The Process of Islamic Revolution"। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হবার পরের কয়েক বছর মুসলিম লীগ সরকার কেনো ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এর জবাব ঐ বইতে পেয়ে গেলাম। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন উৎসাহী ছাত্র

---

২. বাংলায় এ বইটি প্রথম কয়েক বছর "ইসলামী বিপ্লবের পথ" নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে "ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়" নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

কর্মী হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের যে আকৃতি অন্তরে পোষণ করতাম তা মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থেকে পাওয়া যাবে না বলে নিশ্চিত হলাম।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ঐ বক্তৃতার পর মাওলানা তার মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরামর্শ দিতে থাকেন যে, পাকিস্তান কায়েমের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কী কী কাজ করা দরকার। তিনি মুসলমানদের ঐক্যের স্বার্থে নিজে আলাদা দল গঠন করা থেকে বিরত ছিলেন। ইতঃমধ্যে তিনি তার পত্রিকা ও পুস্তকাদির বিরাট সংখ্যক পাঠকের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করেন।

রাজনৈতিক ময়দানে একদিকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, অপরদিকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে জনগণের মধ্যে মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মুসলমানরা দলে দলে মুসলিম লীগে যোগ দিতে লাগলো। "পাকিস্তান কা মতলব কিয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "মুসলিম হো তো মুসলিম লীগ মে আ"-এ দুটো শ্লোগান সারা ভারতে ব্যাপকভাবে চালু হয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে চললো।

কিন্তু পাকিস্তানে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কায়েম করার সামান্য প্রস্তুতিরও কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যারা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই ছিলেন, যারা ইসলামকে জানে এবং নিজের জীবনে মেনে চলে। এদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কথা নিছক ধোঁকাবাজী বলে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের সাথে থাকার অজুহাত দেখালো। কিন্তু মাওলানা মওদূদী তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, যে কোনো অবস্থায়ই কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করা জায়েয হতে পারে না। কংগ্রেসের সাথে থাকাকে তিনি মুসলমানদের জন্য আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করেন।

মাওলানা মওদূদী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাকিস্তান কায়েম হবার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা ইসলামকে ভালোবাসেন তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে সাহায্য করা এবং যারা এর বিরোধী তাদের উপর মুসলিম জনগণের চাপ সৃষ্টি করার যোগ্য একদল লোক তৈরি করতে হবে। তাই এ উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন কায়েম করার জন্য তিনি মাসিক তরজুমানুল কুরআন পত্রিকার মাধ্যমেই ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে "এক সালেহ জামায়াত কি যরুরত" (একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন) নামে এক প্রবন্ধের মাধ্যমে পত্রিকার নিয়মিত পাঠকদেরকে দাওয়াত দেন। ৯টি বছরে এ পত্রিকা যাদের চিন্তাধারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তাদের মধ্য থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৭৫ জন লোক ১৯৪১ সালের

২৫ আগস্ট লাহোরে সমবেত হন। তারা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক এবং কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তান দাবির সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করে একটি পৃথক সংগঠন গড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা তখনকার পরিবেশে সহজ ব্যাপার ছিলো না।

ঐ ৭৫ জনই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মাওলানা মওদূদী সর্বসম্মতভাবে এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের বিস্তারিত কার্যবিবরণী পুস্তিকাকারে সংগঠনের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, এ সংগঠন কায়েমের একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ মহান দায়িত্ব পালন করা যার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন এবং যা করার দায়িত্ব নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের উপরও দেওয়া হয়েছে।

এ কাজটিকে দুটো নামে কুরআন উল্লেখ করা হয়েছে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং ইকামাতে দীন। হাদীসে আরো একটি নাম রয়েছে খেলাফত আলা মিনহাজিহিন নবুওয়াত। এ তিনটি পরিভাষা দ্বারা একই বিষয় বোঝায়। আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে দীনকে বিজীয় করা বা রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা বা ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা– এ সবই সমার্থবোধক পরিভাষা।

ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহ যত নিষ্ঠার সাথেই পালন করা হোক, দীনের ইল্‌ম শিক্ষা দেবার জন্য যতো চেষ্টাই করা হোক, ওয়াজ ও তাবলীগের মাধ্যমে জনগণকে ধার্মিক হবার যতো তাকীদই দেওয়া হোক, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্বকে অবহেলা করলে দীনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপরোক্ত কাজগুলো অবশ্যই ইকামাতে দীনের সহায়ক। কিন্তু ঐ কাজগুলোই যথেষ্ট নয়।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৭

১৯৪১ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত ছিলো। জামায়াত দুটো কাজের ওপরই প্রধান গুরুত্ব দিয়ে এ ৬ বছর সাধনা করেছে। যারা জামায়াতে যোগ দিচ্ছিলেন তাদের মন-মগজ চরিত্র ইসলামী বিপ্লব সাধনের যোগ্য করে গড়ে তোলাই ছিলো প্রথম কাজ। সবাই নিষ্ঠার সাথে এ কাজে ব্রতী ছিলেন। যারা শেখাবার যোগ্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হলেন। আর মাওলানা মওদূদী রহ. এ প্রশিক্ষকদেরকে পরিচালনা করছিলেন।

দ্বিতীয় প্রধান কাজটি প্রধানত মাওলানা মওদূদী রহ. নিজেই করছিলেন। সেটি হলো আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করতে হলে এ যুগের সমস্যাবলির ইসলামী সমাধান বের করা। মানব সমাজের মূল সমস্যা এক থাকলেও যুগে যুগে সমস্যার রূপ বদলায়। ইসলামী মূলনীতি ও বিধানের ভিত্তিতে যুগ সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান আধুনিক যুগের মানুষের বোঝার উপযোগী ভাষায় পরিবেশন করার কঠিন দায়িত্বটিই মাওলানা মওদূদী রহ. নিজের কাঁধে তুলে নেন। এ পর্যায়ে এ ছ' বছরে তিনি অনেক মূল্যবান বই লিখেছেন।

এ সময়টাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তীব্র আকারে চলছিলো। সরাসরি মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গেলে জামায়াতের উপরোক্ত ২-দফা কাজ বন্ধ রাখতে হতো। তাই জামায়াত এ কয় বছর পত্রিকা ও জনসভার মাধ্যমে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় এক-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করে পাকিস্তান আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মতো আরো কয়েকটি মুসলিম সংগঠনের কার্যকলাপ যেভাবে কংগ্রেসের শক্তি যোগাচ্ছিলো এবং মুসলিম ঐক্য ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছিলো এদের বিরুদ্ধে জামায়াত বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে চিন্তার যে খোরাক যুগিয়েছে তা পাকিস্তান আন্দোলনকে বিরাটভাবে সাহায্য করেছে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। ৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট নামক স্থানে দারুল ইসলাম নামে একটি জনপদ গঠন করে সেখানে কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপন করা হয়। ভারত বিভক্ত হয়ে যাবার পর স্বাভাবিকভাবেই জামায়াতও বিভক্ত হয়। মাওলানা মওদূদী এবং কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই হিজরত করে লাহোর চলে যান। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নির্বাচনে মাওলানা মওদূদী-ই আমীর নির্বাচিত হন।

ইতঃপূর্বে ৬ বছর ইসলামী সাহিত্য রচনা ও ইসলামী বিপ্লবের একদল সৈনিক তৈরির মাধ্যমে যে প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হলো সে পুঁজিটুকু নিয়ে জামায়াত পাকিস্তানকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত ১১ বছর জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা এটাই ছিলো।

পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জামায়াত আন্দোলনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করে এর দুটো দিক রয়েছে :

১. ইসলামী আদর্শে পাকিস্তানকে গড়ে তোলা।

২. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বহাল রাখা।

ইসলামের দোহাই দিয়েই পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম জাতির সমর্থন চাওয়া হয় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই পাকিস্তান কায়েম হয়। তাই জামায়াতে ইসলামীও গণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন করে পাকিস্তানকে মযবুত ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত ভারতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। নতুন রাষ্ট্রটির জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা ও দেশ পরিচালনার প্রয়োজনীয় আইন রচনা করাই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিলো। পাকিস্তানকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যা কিছু করণীয় তা করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও গণপরিষদের হাতেই ছিলো।

আদর্শ প্রস্তাবের দাবি

প্রতিবেশী ভারতের গণপরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দ্রুত এগিয়ে চলা সত্ত্বেও পাকিস্তান গণপরিষদ এ বিষয়ে আলোচনা শুরু না করায় মাওলানা মওদূদী ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর আইন কলেজে এবং মার্চে করাচির জাহাঙ্গীর পার্কের ঐতিহাসিক সমাবেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রাথমিক ঘোষণা হিসেবে নিম্নরূপ ৪-দফা দাবি পেশ করেন :

১. পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌম মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং এ রাষ্ট্রে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

২. এ যাবত যতো প্রকার ইসলাম বিরোধী আইন বলবৎ আছে তা সবই রহিত করতে হবে।

৩. একমাত্র ইসলামী শরীয়তই হবে পাকিস্তানের যাবতীয় আইন কানুনের উৎস।

৪. শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে হবে।

মাওলানা মওদূদী এসব দাবির পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করেন। বিশেষ করে তিনি বলেন যে, একজন ব্যক্তি যেমন ইসলাম অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে কালেমা তাইয়্যেবা উচ্চারণ করে তেমনি পাকিস্তানের কণ্ঠ হিসেবে গণপরিষদকে এ ঘোষণা দিতে হবে যে, এ দেশ ইসলাম অনুযায়ী চলবে। উক্ত ৪-দফার মাধ্যমেই এ ঘোষণা দিতে হবে।

সরকার এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। জামায়াত এ ৪-দফা দাবি নিয়েই সর্বপ্রথম ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করে। এ দাবির মাধ্যমেই জামায়াত গণসংগঠনের সূচনা করে। সরকার এ আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে ঐ বছরই অক্টোবরে মাওলানা মওদূদী ও সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে।

কিন্তু এতে আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে। জনগণ ইসলামের নামেই পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে বলে এ দাবির জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক ছিলো। অপরদিকে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান ও মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর জোরালো সমর্থনে গণপরিষদের অভ্যন্তরেও ঐ দাবির পক্ষে শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ এর ১২ মার্চ আদর্শ প্রস্তাব নামে ঐ ৪ দফা দাবি গণপরিষদে ভাষার কিছু তারতম্য সহকারে পাস হয়ে যায়। এ প্রস্তাবটি পাস করার মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ভাটা পড়বে বলে সরকারের আশা

ছিলো। কিন্তু আদর্শ প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র ত্বরান্বিত করার জন্য প্রবল গণচাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরো জোরদার হলো। এ কারণেই আদর্শ প্রস্তাব পাস হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাবক মাওলানা মওদূদীর আটকাদেশ ছয় মাস করে বৃদ্ধি পেতে থাকলো। দীর্ঘ ২০ মাস কারাভোগের পর ১৯৫০-এর মে মাসে তিনি মুক্তি পান।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার প্রবল দাবির ফলে ৫০-এর সেপ্টেম্বরে গণপরিষদে শাসনতন্ত্র মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হলে দেখা গেলো যে, আদর্শ প্রস্তাবে যেসব ওয়াদা রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাসনতন্ত্র রচনার এমন মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রের উপযোগী। এর প্রতিবাদে ১৪ অক্টোবর লাহোরের বিরাট সমাবেশে মাওলানা মওদূদী হুশিয়ার করে দেন যে, আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা না হলে জনগণ কিছুতেই তা গ্রহণ করবে না।

সরকার এর জবাবে আলেম সমাজকে চ্যালেঞ্জ দিলেন যে ইসলামী শাসনতন্ত্র বলতে তারা কী বোঝাতে চান তা তারাই রচনা করে দেখান। সরকারের ধারণা ছিলো যে, ছোটো ছোটো বিষয়ে পর্যন্ত আলেমদের মধ্যে এতো মতবিরোধ রয়েছে যে তারা শাসনতন্ত্রের মতো বিরাট ও জটিল বিষয়ে একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হবেন না।

আলেম সমাজ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৯৫১-এর ২১ জানুয়ারি করাচিতে সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে মিলিত হন। হানাফী, আহলে হাদীস ও শিয়াসহ উল্লেখযোগ্য সমস্ত মতের নেতৃস্থানীয় ৩১ জন ওলামা ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব এতে ছিলো। আল্লামা সুলাইমান নদভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২-দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে গণপরিষদকে এর ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনার আহ্বান জানান।

এরপর সরকারের মুখ এমনভাবে বন্ধ হয়ে যায় যে, ৫১ সালের ১৬ অক্টোবর উজীরে আযম নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়া পর্যন্ত শাসনতন্ত্র রচনার নামও তিনি উচ্চারণ করেন নি। ২১ নভেম্বর করাচির জনসভায় মাওলানা মওদূদী শাসনতন্ত্র রচনায় সরকারি গড়িমসির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া গণপরিষদে পেশ করার জোড়ালো দাবি জানান।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের সমর্থক খাজা নাযীমুদ্দীন তখন উজীরে আযম। তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে মনোযোগ দেন। '৫২ সালের ডিসেম্বর গণপরিষদে এমন একটি খসড়া পেশ করা হয় যা আলেম সমাজ প্রত্যাখ্যান না করে বিবেচনাযোগ্য বলে গণ্য করেন। '৫৩ সালের জানুয়ারিতে পূর্বোক্ত ৩১ জন ওলামার আবার সম্মেলন হয় এবং কতক সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের চরম বিরোধী তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদ নেতা ও উজীরে আযম খাজা নাযীমুদ্দীনকে অপসারণ করে আমেরিকায় কর্মরত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলী বগরাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। গণপরিষদ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি তাদের নির্বাচিত নেতার বদলে নিযুক্ত নেতাকে বরণ করতে লজ্জাবোধ করলো না।

কিন্তু গভর্ণর জেনারেল যে আশায় আমেরিকা থেকে প্রধানমন্ত্রী আমদানী করলেন সে আশা পূরণ হলো না। '৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচিত উজীরে আলা নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলেও তারা গণপরিষদের সদস্য হিসেবে রয়ে গেলেন এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করে জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নেন।

গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চললো। বগরা মুহাম্মাদ আলী ঘোষণা করলেন যে, '৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির পিতা কায়েদে আযমের জন্মদিনে জাতিকে দেশের প্রথম শাসনতন্ত্র উপহার দেওয়া হবে। গভর্ণর জেনারেল খাদ্য সাহায্যের তদবিরের অজুহাতে উজীরে আযমকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়ে ২৫ ডিসেম্বরের আগেই গণপরিষদ ভেঙে দিলেন।

মাওলানা আকরাম খান আফসোস করে আমাকে বললেন, যে ওলামা সম্মেলনের ২২-দফা ও সংশোধনী প্রস্তাবের সমন্বয়ে একটি আদর্শ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছিলো যা পাস করতে দেওয়া হলো না।

গভর্ণর জেনারেল একটি মনোনীত গণপরিষদের দ্বারা তার মনমতো শাসনতন্ত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন গণপরিষদের স্পিকার মৌলভি তমিজউদ্দিন খানের মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট পুনরায় গণপরিষদ নির্বাচনের নির্দেশ দেয়। নবগঠিত গণপরিষদ চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে ইসলামী রিপাবলিক অব পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্র এর চেয়ে অধিকতর ইসলামী ছিলো।

পাকিস্তানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য জামায়াতে ইসলামী অবিরাম সংগ্রামে করেছে। '৫১ সালের ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠানে জামায়াতের ভূমিকাই প্রধান ছিলো এবং ২২-দফা প্রণয়নে মাওলানা মওদূদীর অবদান সবচেয়ে বেশি ছিলো।

১৯৫৬ ও '৫৭ সালে জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো পৃথক নির্বাচন বহাল রাখার পক্ষে। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি না থাকলে পাকিস্তান সৃষ্টিই হতো না। পাকিস্তানের হেফাযতের জন্যই জামায়াত এ পদ্ধতি বহাল রাখা জরুরি বলে মনে করতো। কিন্তু আওয়ামীলীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের উজীরে আযম থাকাকালে জাতির ওপর যুক্ত নির্বাচন চাপিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের বীজ বপন করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষবাদী রাজনীতি চালু হয়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৪

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে একই সাথে পাকিস্তান ও ভারত ইংরেজ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৯ সালেই ভারত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করে এবং শাসনতন্ত্র মোতাবেক দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয়। কিন্তু পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের গণদাবি সরকার মেনে নিতে সম্মত না হওয়ায় শাসনতন্ত্র রচনা বিলম্বিত হয়। স্বাধীনতা লাভের ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে এমন একটি শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় যা নামেমাত্র ইসলামী। গণতন্ত্রের দিক দিয়ে সন্তোষজনক হওয়ার কারণে জামায়াতে ইসলামী ঐ শাসনতন্ত্রকে গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করে। জামায়াত আশা করেছিলো যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার গণদাবি পূরণ হওয়া সম্ভব হবে।

১৯৫৪ সাল থেকেই গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ প্রতিরক্ষা সচিব ইসকান্দার মির্যা ও সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খানের যৌথ ষড়যন্ত্রে ইসলাম ও গণতন্ত্র বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে একটি নিম-ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে যাওয়ার পরও ঐ ত্রিচক্রীর ষড়যন্ত্র বন্ধ হয় নি। ইতোমধ্যে গোলাম মুহাম্মদের মৃত্যুর পর জেনারেল আইয়ুবের চাপে ইস্‌কান্দার মির্যা গভর্ণর জেনারেল হয়।

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝিতে সরকার ঘোষণা করে যে নতুন শাসনতন্ত্র মোতাবেক ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সমগ্র পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন হলেও একবারও জনগণের ভোটে কেন্দ্রীয় আইন সভার কোনো নির্বাচন হয় নি। '৫৯ সালে যদি নির্বাচন হতে পারতো তাহলে সেটাই হতো পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দিবাগত রাতে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্যাকে দিয়ে সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দেওয়ার ২০ দিন পর জেনারেল আইয়ুব খান

ইস্কান্দার মির্যাকে অপসারণ করে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক সেজে বসেন। সামরিক আইন বলে সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করায় রাজনৈতিক কার্যাবলি মুলতবী হয়ে গেলো। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মসূচি চালু না থাকলে জামায়াতের ৪-দফা কর্মসূচির বাকী ৩-দফা স্থানীয়ভাবে বেনামীতে অব্যাহত রাখা হয়। দীনের দাওয়াত, ব্যক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক কাজ ও সমাজ সেবামূলক কার্যাবলি-এ তিনটি দফার কাজ কোনো অবস্থায়ই বন্ধ হতে পারে না। বাংলাদেশেও জামায়াত বেআইনী থাকা অবস্থায় '৭২ থেকে '৭৯ সালের মে পর্যন্ত এ তিন দফার কাজ গোপনে চলতে থাকে।

১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের প্রবর্তিত তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে তারই নিযুক্ত এক কমিশন যে শাসনতন্ত্র রচনা করে তার ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদেরকে ইলেকটোরাল কলেজ গণ্য করে তাদের ভোটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরই নাম দেওয়া হয় বুনিয়াদী গণতন্ত্র (Basic Democracy)।

নির্বাচনের পর ৬২ সালের জুন মাসে পার্লামেন্টে আইন পাসের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। এরপর মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে জামায়াত সারা দেশে সাংগঠনকে পূর্বাবস্থায় বহাল করতে সমর্থ হয়। মাওলানা মওদূদীর ভাষায় "জামায়াতের রেলগাড়ী সামরিক শাসনের পৌণে চার বছর লাইনের উপরই দাঁড়িয়ে হুইসিলের অপেক্ষায় ছিলো। তাই এ গাড়ী চালু করতে বিলম্ব হয় নি।"

রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হবার পর স্বাভাবিক কারণেই বুনিয়াদী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠলো। পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী জনগণের ভোটাধিকার বহাল করার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগ নেতাদের একাংশ আইয়ুব মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার ফলে এ দলের ভূমিকা দুর্বল ছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন পৃথকভাবে গড়ে উঠে। জনাব সোহরাওয়ার্দী করাচিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেও তার রাজনৈতিক শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য ছিলো না। তাই নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনিই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মিলে ৯ নেতার জোট গঠন করেন। এ জোটের নেতৃত্ব দেন জনাব সোহরাওয়ার্দী ও জনাব নূরুল আমীন।

এ আন্দোলনের মূল দাবি ছিলো নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণ পরিষদ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানে এ আন্দোলন দানা বাঁধলেও পশ্চিম পাকিস্তান এতে শরীক না হলে উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হবে না বলেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ৯ নেতা পশ্চিম পাকিস্তান গেলেন। সর্বপ্রথম তাঁরা মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাত করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী জানতেন না যে, সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে সেখানে কোনো দল জামায়াতের সমকক্ষ নয়। তাছাড়া মাওলানা মওদূদী এ আন্দোলনে শরীক হলে আইয়ুব বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী সব নেতাই এগিয়ে আসবেন।

মাওলানা মওদূদী জনাব সোহরাওয়ার্দী ও জনাব নূরুল আমীন থেকে তাদের বক্তব্য শোনার পর বললেন :

"আপনারা বিবেচনা করে দেখুন যে, দুনিয়ার কোথায়ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অল্প সময়ে সামরিক শাসনকর্তার প্রবর্তিত গোটা শাসনব্যবস্থা এক সাথে বদলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বর্তমানে একটি শাসনতন্ত্র চালু করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে জাতীয় সংসদও নির্বাচিত হয়েছে। সামরিক শাসনের বদলে শাসনতান্ত্রিক সরকারও কায়েম হয়েছে। এখন নতুন শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমরা বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করছি এবং বর্তমান সংসদ ও সরকারকেও বৈধ মনে করছি না। ইতোমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নেতা বর্তমান সরকারে যোগদান করেছেন।

"এমতাবস্থায় আপনাদের প্রস্তাবিত আন্দোলন দীর্ঘ সংগ্রাম ও অপরিসীম কুরবানী সত্ত্বেও সফল হওয়া কঠিন। তাই আমি বহু চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলন করাই অধিকতর যুক্তিপূর্ণ।"

"আমাদের উদ্দেশ্য হলো তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্র উৎখাত করা ও জনগণের ভোটাধিকার বহাল করে সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল করা। এ উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের একটি বাস্তব সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া আপনাদের সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হতে আমি প্রস্তুত আছি। এ প্রস্তাব অনুযায়ী বর্তমান জাতীয় সংসদের ভেতরেও আন্দোলন হতে পারে। শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করলে এ সংসদকে বাতিলের দাবিও করতে হবে। তাহলে আন্দোলন শুধু জনগণের ময়দানে সীমাবদ্ধ থাকবে। সংসদে আওয়াজ তোলার কোনো সুযোগ থাকবে না।

আপনারা ধীর চিত্তে আমার বক্তব্য ও প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখুন। আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় থাকবো।"

মাওলানার বক্তব্যের পর ৯ নেতা চিন্তিত মনে বিদায় নিলেন এবং ৯ নেতার আন্দোলন আর অগ্রসর হতে পারলো না।

আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য বিরোধী দল পৃথক পৃথকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা এতো বলিষ্ঠ ছিলো যে, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব সরকার তীব্র জামায়াত বিরোধী প্রচারণা চালাতে লাগলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল হাবীবুল্লাহ খান ঘন ঘন বিবৃতি ছাড়তে লাগলেন। সরকার সমর্থক পত্রিকা ও রেডিও রীতিমত জামায়াত বিরোধী অভিযান চালাতে লাগলো।

লাহোরে ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত জামায়াতের নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে মাইক ব্যবহার করতে দিলো না। সম্মেলনে গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিলো। প্যান্ডেলে আগুন ধরিয়ে মাওলানাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে সম্মেলন বানচালের চেষ্টা করলো। ত্রিশ হাজার লোকের ঐ সম্মেলনে মাওলানা মওদূদী যে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় দিলেন তা অতুলনীয়। মাওলানা ঘোষণা করলেন যে, ডেলিগেটগণ সবাই যার যার জায়গায় ধৈর্য্যের সাথে অবস্থান করুন। গুণ্ডাবাহিনীকে দমন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণই যথেষ্ট।

আমি মাওলানার খুব কাছেই মঞ্চের সামনে ছিলাম। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ২৫/৩০ জনের গুণ্ডাবাহিনীটি মঞ্চের মাত্র ৫০ হাত দূরে পৌঁছে গেছে এবং জামায়াতের ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক তাদের ঘেরাও করে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবকদের বেশির ভাগই সশস্ত্র পাঠান এবং উপজাতি থাকায় গুণ্ডাবাহিনী সরে যেতে বাধ্য হলো। সম্মেলনের হাজার হাজার ডেলিগেট যদি আসন ছেড়ে ছুটাছুটি করতো বা গুণ্ডাদেরকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতো তাহলে সম্মেলন পণ্ড হয়ে যেতো এবং গুণ্ডাদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হতো না। ফলে গুণ্ডারা সহজেই আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারতো।

১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ অধিবেশনে মাওলানা মওদূদী বললেন যে, সরকার গত কয় মাস যে অভিযান জামায়াতের বিরুদ্ধে চালিয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করা। ৬ জানুয়ারি ভোর রাতে পুলিশ কেন্দ্রীয় অফিস ঘেরাও করে মজলিসে আমেলার সকল সদস্যকে গ্রেফতার করলো। আমরা যে কয়জন পূর্বপাকিস্তান থেকে গিয়েছিলাম তারাও লাহোরেই গ্রেফতার হয়ে গেলাম। সকালে রেডিও থেকে জানা গেলো যে, জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

সামরিক শাসনকালে সকল রাজনৈতিক দলই বেআইনী ছিলো। কিন্তু ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন অবসান হবার পর আইয়ুব খানের ৮ বছরের শাসনকালে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সকল বিরোধী দলের মধ্যে জামায়াতের প্রতি অতিরিক্ত আক্রোশের প্রধান কারণ জামায়াতের আদর্শিক দৃঢ়তা। আইয়ুব খান কতক পীর ও আলেমের সমর্থন যোগার করে ইসলামের 'হিরো' হবার যে চেষ্টা করেন তা জামায়াতের কারণেই ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি যে মানের ইসলামের ধারক সাজার চেষ্টা করেন তা খাঁটি বলে প্রমাণ করতে হলে জামায়াতকে ময়দান থেকে অপসারণ করা ছাড়া উপায় নেই বলে মনে করা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের পূর্ণ যে রূপ জামায়াত জনগণের সামনে তুলে ধরেছে তার প্রচার বন্ধ করাই জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণার প্রধান কারণ।

এ ঘোষণার বিরুদ্ধে জামায়াত হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট জামায়াতের পক্ষে এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেওয়ার ফলে সুপ্রিমকোর্টে আপীল মামলা দায়ের করা হয়। সুপ্রিমকোর্ট সেপ্টেম্বর মাসে (৬৪ সাল) জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করাটাই বেআইনী হয়েছে বলে রায় দেয়।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৬৫

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যাতে প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে পরাজিত করা যায় সে উদ্দেশ্যে Combined Opposition Partis (COP) নামে জোট গঠন করা হয়। জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, নেযামে ইসলাম ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ COP নামে একমঞ্চে সমবেত হয় এবং কায়েদে আযমের বোন ফাতেমা জিন্নাহকে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করা হয়।

আর কোনো ব্যক্তির পক্ষে ৫টি দলের ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব না হওয়ায় জামায়াতকেও এ সিদ্ধান্তে একমত হতে হয়। COP-এর বৈঠক করাচিতে হচ্ছিলো। মহিলা প্রার্থীকে সমর্থনের প্রশ্নে জামায়াত দু'জনের রায় নেওয়া কর্তব্য মনে করে। একজন পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী এবং অপরজন মাওলানা মওদূদী। জামায়াতের করাচি আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মাদের নেতৃত্বে আমরা মুফতী সাহেবের করাচিস্থ বাসভবনে গেলাম।

চৌধুরী সাহেব মুফতী সাহেবের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন :

"ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২-দফা মূলনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রধান মুসলমান পুরুষ হতে হবে। স্বৈরশাসনের অবসানের উদ্দেশ্যে সকল দলের সম্মিলিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী প্রয়োজন। মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির পক্ষে সবাই একমত হচ্ছে না। নেযামে ইসলাম পার্টিও মত দিয়েছে। জামায়াত আপনার মতামত না নিয়ে সমর্থন করা সমীচীন মনে করে না।"

"আমরা একটি যুক্তির ভিত্তিতে এ প্রস্তাব সমর্থন করা বিবেচনাযোগ্য মনে করছি। ফাতেমা জিন্নাহকে দেশ শাসনের জন্য কয়েক বছরের মেয়াদে প্রেসিডেন্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। মুহতারামা নিজেই বলেছেন যে, এ বৃদ্ধ বয়সে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু ৬ মাসের জন্য দায়িত্ব নিতে পারি যাতে নির্বাচিত হবার পর জাতীয় সংসদের নির্বাচন করিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায়। স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্বটুকু পালনের জন্য আমি প্রার্থী হতে রাযী আছি। এ অবস্থায় জামায়াতের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব সমর্থন করা চলে কিনা সে বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত রায় জানার পর সে অনুযায়ী জামায়াত সিদ্ধান্ত নেবে।"

মুফতী সাহেব চৌধুরী সাহেবের বক্তব্য শোনার পর বললেন, "স্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে না। স্বৈরশাসক থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সম্মিলিত বিরোধী দলকে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলার সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সে উদ্দেশ্যে তাকে অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই বলে যদি আপনারা মনে করেন তাহলে এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন। কিন্তু স্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদ দেওয়া যেতে পারে না।"

মাওলানা মওদূদী তখনও জেলে ছিলেন, জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করার বিরুদ্ধে মামলার নিষ্পত্তি তখনও হয় নি। আমি আগস্ট মাসে হাইকোর্টে রীট করার ফলে মুক্তি পেয়ে যাই। মাওলানার মতামত জানার জন্য জেলেই যোগাযোগ করা হলে তিনিও মুফতী শফী সাহেবের অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ এক সাথে যতো সফর করেছেন তাতে জামায়াতের প্রথম সারির নেতাগণ কর্ম-তৎপরতায় কারো পেছনে ছিলেন না। নির্বাচন উপলক্ষে এমন গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিলো যে, যদি জনগণের হাতে ভোটাধিকার থাকতো তাহলে বিরাট ব্যবধানে আইয়ুব খানকে

পরাজিত হতে হতো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০+৪০=৮০ হাজার বি.ডি. মেম্বার নির্বাচনের সময় জনগণ ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবার ওয়াদা নিয়ে ভোট দিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়, পূর্ব পাকিস্তানে ফাতেমা জিন্নাহ অধিকাংশ ভোট পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে আইয়ুব খান বেশি ভোট দখল করায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে পারলো না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে মাওলানা মওদূদীর একটি মন্তব্য পশ্চিম পাকিস্তানে এতো জনপ্রিয় হয়েছিলো যে জনগণের মুখে মুখে তা ব্যাপক উচ্চারিত হতো। কথাটি এই : "ফাতেমা জিন্নাহর মধ্যে মহিলা হওয়া ছাড়া আর কোনো দোষ নেই, আর আইয়ুব খানের মধ্যে পুরুষ হওয়া ছাড়া আর কোনো গুণ নেই।"

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০

পি.ডি.এম

১৯৬৫ সালে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা করে। এতে যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর নিকট ভারত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ঐ যুদ্ধে সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানরা বিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। যুদ্ধে ভারতের সুবিধা হচ্ছে না দেখেই ভারতের বন্ধু রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে পাক-ভারত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের বিজয়কে আইয়ুব খান ঐ চুক্তির মাধ্যমে পরাজয়ে পরিণত করার অভিযোগে বিরোধী দলসমূহ আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেয়।

লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর বাসভবনে Pakistan Democratic Movement (PDM) নামে ঐক্যজোট গঠন করা হয়। এতে পূর্বের COP-এর দলগুলো শরীক হবার কথা ছিলো। কিন্তু আন্দোলনের ইস্যুতে আওয়ামীলীগ বিভক্ত হয়ে যায়। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একাংশ P.D.M. এ যোগদান করলো। আর শেখ মুজিব শুধু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগকে নিয়ে পৃথক রয়ে গেলেন। ন্যাপও পি.ডি.এম-এর বাইরে রয়ে গেলো। জনাব নূরুল আমীন ও মাহমুদ আলীর N.D.F. (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) এতে শরীক হয়।

পি.ডি.এম গোটা পাকিস্তানে আইয়ুব খানের তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্র উৎখাত করে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ৫-দফা ইস্যু নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এতে জামায়াতের ভূমিকা সবচেয়ে বলিষ্ঠ ছিলো বলে স্বীকৃত। পি.ডি.এম-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি এডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযমের পরিচালনায় এ আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

ডি.এ.সি (DAC)

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরো জোরদার হলে পি.ডি.এম ভুক্ত ৫টি দলের সাথে আওয়ামী লীগসহ আরো তিনটি দল মিলে আট দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয় এবং পি.ডি.এম নামের বদলে DAC নাম ধারণ করে। পি.ডি.এম এর ৫-দফা দাবির সাথে আরো ৩টি দফা যোগ করে DAC-এর ৮-দফা দাবিনামা প্রণীত হয়। DAC-এর আটটি দলের সর্বসম্মত ৮-দফা দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরো ব্যাপক ভিত্তিতে ঐক্যের ডাক দেয়।

Democratic Action Committee (DAC)-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়কের দায়িত্ব পি.ডি.এম সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ও পূর্ব পাকিস্তানের আহ্বায়কের দায়িত্ব খোন্দকার মুশতাক আহমদের ওপর দেওয়া হলো। এ জোটের আন্দোলনেও জামায়াতে ইসলামী পূর্বের মতোই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৯ সালে DAC-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন গোটা পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠকে বসে DAC-এর ৮-দফা দাবির ভিত্তিতে আলোচনা করার আহ্বান জানায়। DAC শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বৈরশাসন অবসান করে গণতন্ত্র বহাল করার উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেয়।

গোল টেবিল বৈঠক DAC-এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, ৮টি দলের প্রত্যেকটি থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি বৈঠকে যোগদান করবেন। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, এ দু'জনের একজন পূর্ব পাকিস্তান এবং আর একজন পশ্চিম থেকে হতে হবে। আওয়ামী লীগের নিখিল পাকিস্তান সংগঠন আগেই ভেঙে গিয়েছিলো। তাই পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামীলীগ সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গোল টেবিলে যোগদান করেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা মওদূদী এবং পূর্ব পাকিস্তানের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম গোল টেবিল বৈঠকের জন্য মনোনীত হন।

গোল টেবিল বৈঠক

গোল টেবিল বৈঠক রাওয়াল পিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বসার পূর্বে DAC-এর প্রতিনিধিদের বৈঠক হয় । আইয়ুব খানের সাথে আলোচনার ব্যাপারে এ বৈঠকে পলিসিগত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। DAC-এর আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, "সামরিক প্রতি বিপ্লব, সশস্ত্র

সংগ্রাম বা রক্তঝরা গণআন্দোলন ছাড়া মিলিটারি ডিকটেটর থেকে নাজাত পাওয়ার কোনো নযীর নেই। পাকিস্তানের ওপর আল্লাহর রহমত যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত আমাদের আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। DAC-এর আটটি দলের সর্বসম্মত ৮-দফা দাবি মেনে নিয়েই আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠকে বসতে প্রস্তুত হয়েছেন। এ আট দফা কোনো দলের একক নয়। এ দফাগুলো আমাদের সবার।

"আমরা যদি গোল টেবিল বৈঠককে সফল করতে চাই তাহলে ৮-দফার বাইরে কোনো বিষয় বৈঠকে উত্থাপন করতে দিতে পারি না। যদি কেউ নতুন কোনো দাবি তোলেন তাহলে আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া আইয়ুব খানও নতুন কোনো দাবি মেনে নেবেন না। এ অবস্থায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে গণতন্ত্র বহাল করতে ব্যর্থ হবো এবং আবার নতুন করে সামরিক শাসনের খপ্পরে পড়বো।"

এ বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে খোন্দকার মুশতাক আহমদ উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব তখনো আগরতলা মামলার কারণে জেলে ছিলেন। ঐ সময় ঢাকায় ঐ মামলার শুনানী চলছিলো। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে সরকার ঐ মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিব 'হিরো' হিসেবে মুক্তি পান এবং যথাসময়ে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে যারা DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তাদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী, জনাব ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি মুরশিদকে গোল টেবিলে দাওয়াত দেবার জন্য DAC-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হলে আইয়ুব খান তা মেনে নিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দেন। শেষোক্ত দু'জন যথাসময়ে যোগদান না করে ময়দানে হৈ চৈ করতে থাকেন।

DAC নেতৃবৃন্দ অনুভব করছিলেন যে, ঐ দু'জন যে ধরনের কথাবার্তা বলেছেন তাতে গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্য চান না বলেই বোঝা যায়। তাই তাদেরকেও শামিল করার প্রস্তাব করা হয় যাতে বাইরে সমস্যা সৃষ্টি না করে তাদের বক্তব্য গোল টেবিল বৈঠকেই পেশ করার সুযোগ পান। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা গেলো যে, মাওলানা ভাসানী জনাব ভুট্টোর দাওয়াতে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে ভুট্টোর সুরে সুর মিলিয়ে নিজস্ব ঢং-এ বক্তব্য দিতে থাকলেন।

মাওলানা ভাসানী ও জনাব ভুট্টোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মিল না থাকলেও গোল টেবিল বৈঠক বানচাল করার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যের বিস্ময়কর ঐক্য কেমন করে যেন সৃষ্টি হয়ে গেলো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে

বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো মহত উদ্দেশ্য তাদেরকে যে ঐক্যবদ্ধ করে নি সে কথা সুস্পষ্ট।

পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণের পর বিচারপতি মুরশিদ রাজনৈতিক ময়দানে অবতরণ করার পর এয়ার মার্শাল আসগর খানের সাথে মিলে কাজ শুরু করলেন। তাই এ দু'জনকেও গোল টেবিল বৈঠকে শরীক করা প্রয়োজন বলে DAC মনে করেছে।

গোল টেবিল বৈঠকে সমস্যা

গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন মাত্র একদিন স্থায়ী হয়। ঈদুল আযহার জন্য বৈঠক মুলতবী হয়ে যায়। প্রথম দিনের এ বৈঠকে DAC এর ১৬ জন প্রতিনিধি ও সরকারি দলের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন।

ঈদের পর রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌছার পূর্বে লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাসভবনে DAC-এর বৈঠক বসে। গোল টেবিল বৈঠকে DAC-এর ভূমিকা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে ৮-দলীয় জোটের সর্বসম্মত ৮-দফা দাবির বদলে শেখ মুজিব তার দলীয় ৬-দফা পেশ করার দাবি জানান। সবাই চরম বিস্ময়ের সাথে স্তব্ধ হয়ে যান। গোল টেবিল বৈঠক বানচাল হয়ে যাবার আশঙ্কায় সবাই হতবাক হয়ে পড়েন। DAC-এর আহ্বায়ক পরদিন সকাল পর্যন্ত বৈঠক মূলতবী করে প্রয়োজনীয় লবীর সুযোগ করে দেন।

আমি তখনই শেখ মুজিবকে বললাম যে, আপনি কী করতে চান তা আমি বুঝতে চাই। এখনি চলুন মাওলানা মওদূদীর বৈঠকখানায়। সাথে সাথে রাযী হয়ে গেলেন এবং জনাব তাজউদ্দীনকে সাথে নিয়ে আমার সাথে জামায়াতের গাড়ীতেই রওনা হলেন। মাওলানা একটু আগেই বৈঠক থেকে ফিরছেন। শেখ সাহেবের আগমনে তিনি আগ্রহের সাথে বৈঠকখানায় এলেন। শেখ মুজিব তার দশ মিনিটের বক্তব্যে যা বললেন এর সারকথা নিম্নরূপ :

"মাওলানা সাহেব, আমি বিরাট সমস্যায় পড়েছি। আপনি মেহেরবানী করে সাহায্য করুন। DAC-এর আট দফা তো ঠিকই আছে। কিন্তু মাওলানা ভাসানী ময়দানে আমার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাত্র ও শ্রমিক মহলকে এই বলে বিভ্রান্ত করছেন যে, আমি নাকি ৬-দফা বাদ দিয়েছি।

তীব্র ক্ষোভের সাথে আরো বললেন, "মাওলানা ভাসানীকে আপনারা চেনেন নি। দীর্ঘকাল তিনি আমার দলের সভাপতি থাকার কারণে তাকে আমি ভালো করেই চিনি। তিনি শুধু ভাঙার গানই গাইতে পারেন, গড়ার চিন্তা তার মগজে নেই।

দেখুন, আমি যখন ৬-দফা ঘোষণা করি তখন সর্বপ্রথম মাওলানা ভাসানীই এর বিরুদ্ধে হৈ চৈ শুরু করেন এবং ৬-দফা আমি ক্যান্সেল করে দিলাম বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু যখন ৬-দফার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলো তখন তিনি আমার ৬-দফার সাথে আরো ৫টি দফা যোগ করে ১১-দফার আন্দোলনে নেমে পড়লেন। আমার জেলে আটক থাকাকালে ছাত্র-যুব-শ্রমিক মহলে তিনি আমার অনুপস্থিতির সুযোগে স্থান করে নিলেন।

"DAC-এর আট দফাতে যেহেতু আমার ৬-দফা নেই সেহেতু আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে তিনি ময়দানে তৎপর রয়েছেন।"

"মাওলানা সাহেব, দেখুন আযম সাহেব শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ৬-দফা সম্পর্কে একই বক্তব্য দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ জঘন্য মাওলানা প্রথমে ৬-দফা ক্যান্সেল করে পরে এর হিরো হলেন। মাওলানা সাহেব, চীনপন্থী এ মাওলানাকে আমি দেশছাড়া করবো। আপনি ৬-দফা সমর্থন করে আমাকে সাহায্য করুন। আমি ভাসানীকে দেখিয়ে দেবো।"

মাওলানা মওদূদী ধৈর্য্যের সাথে তাঁর বক্তব্য শুনে তিন মিনিট কথা বলার পর শেখ মুজিব একদম চুপ হয়ে ভাবতে লাগলেন। মাওলানা বললেন :

"মাওলানা ভাসানীকে আপনি দেখে নিতে চাইলে গোল টেবিল বৈঠক সফল করুন। তিনি গোল টেবিল বৈঠককে বানচাল করার জন্যই ময়দানে নেমেছেন। আপনি যা এখন বললেন তা মাওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্যই সফল করবে। কারণ আপনার দলীয় ৬-দফা DAC-এর কোনো দলই সমর্থন করবে না। আইয়ুব খানের তো এটা বিবেচনা করার প্রশ্নই উঠে না।"

"আপনি ধীরচিত্তে বিবেচনা করুন। মাওলানা ভাসানী কোনো ইস্যু নয়। ইস্যু হচ্ছে গণতন্ত্র বহাল করা। দীর্ঘ আন্দোলনের পর গণতন্ত্র হাসিলের মহা সুযোগ এসেছে। মিলিটারি ডিকটেটর থেকে এতো সহজে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কোনো নযীর ইতিহাসে নেই। এ সুযোগ ব্যর্থ হতে দেবেন না।

"আগরতলা মামলার পর আপনি এখন ন্যাশনাল হিরো। গণতন্ত্র বহাল হলে আপনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন। যদি গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ করে দেন তাহলে আবার মার্শাল ল'য়ের বিপদেই পড়তে হবে।"

মাওলানার বক্তব্যের পর শেখ মুজিব যখন আর কিছুই বলছেন না তখন আমি তাঁকে নিয়ে ইস্ট পাকিস্তান হাউজে পৌছাবার জন্য গাড়ীতে নিয়ে গেলাম। পথে তাকে বললাম যে, আপনার ওপরই গোল টেবিল বৈঠকের সাফল্য নির্ভর

করছে। খুব ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। আমি তার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারার দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আযম সাহেব, আমি বিরাট সমস্যায় পড়েছি।" আমি বললাম, "মাওলানা ভাসানী একা কিছুই করতে পারবেন না। আমরা অন্যান্য ৭টি দল আপনার সাথে আছি। আপনি গোল টেবিল বৈঠক সফল করুন। দেখবেন মাওলানা ভাসানী এমনিতেই ভেসে যাবেন।"

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ আগাগোড়া চুপ থাকলেন। মাওলানা মওদূদীর সামনে তো কিছুই বলেন নি। শেখ সাহেবের সাথে আমার আলোচনার সময়ও চুপ করেই রইলেন। অথচ ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। ঢাকায় আমি দশম শ্রেণিতে থাকাকালে আমার স্কুলের স্কাউট ট্রুপ লীডার ছিলাম। আর তিনি তখন তার স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ও স্কাউট ট্রুপ লীডার। পরবর্তীতেও আমরা পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে বন্ধুত্বের চাহনী নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও এ আলোচনায় মোটেই শরীক হলেন না।

গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেলো

ঈদের পর লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাড়িতে DAC-এর বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬-দফা পেশ করার পর যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো তা সত্ত্বেও গোল টেবিল বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে সবাই রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছলেন। উভয় পক্ষের ১৬ জন করে প্রতিনিধি এক সাথে বসলেন। কিন্তু 'ফরমাল' কোনো আলোচনা শুরু হলো না। হালকা কিছু আপ্যায়ন চলাকালে সাংবাদিকরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বহু ফটো তোলেন।

আইয়ুব খান ও তার সঙ্গীদের সাথে DAC-এর নেতাদের পরিচয়, হাত মিলানো ও খুচরা আলোচনা চললো হাটা-চলা করার সময়। তখনও সাংবাদিকরা ফটো নিতে থাকলেন। আইয়ুব খান টের পেলেন যে, গোল টেবিল বৈঠক চলার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু ফটো সাংবাদিকদেরকে বের হয়ে যেতে বলা হলো। DAC-এর আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান আইয়ুব খানের সাথে কানে কানে একটু কথা বলার পর ঘোষণা করা হলো যে, বৈঠক আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবী করা হলো। সবাই বুঝতে পারলেন যে, শেখ মুজিবকে DAC-এর ৮-দফায় সন্তুষ্ট থাকার জন্য সবাই যাতে বোঝাতে পারে সে জন্য সময় দেওয়া হলো।

পরদিন আবার সবাই যথাস্থানে আসন গ্রহণ করলেন। পূর্বদিনের তোলা ফটোতে যার যার চেহারা যে যে ফটোতে দেখা যায় তাকে সে ফটোর কপি বিলি করে দেওয়া হলো। সাংবাদিকরা আবার ফটো নিলেন। কিন্তু আপ্যায়নের পর বিনা আলোচনায়ই সবাই উঠে গেলেন। রাতেও টেবিল কনফারেন্স বানচাল হয়ে গেলো।

এ ব্যর্থতায় শেখ সাহেবের প্রতিক্রিয়া

গোল টেবিল বৈঠক চলাকালে পিণ্ডিতে জোর গুজব চলছিলো যে, গভীর রাতে শেখ মুজিবের সাথে সেনাপতি ইয়াহইয়া খান গোপন সাক্ষাত করে তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সামরিক শাসনের কোনো আশঙ্কা নেই। বৈঠক থেকে উঠে বাইরে বিশেষ কারণে বের হতেই সাংবাদিকগণ আমাকে ঘেরাও করে এ গুজবের সত্যতা সম্পর্কে চানতে চাইলেন। আমি এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তারা নিরাশ হলেন।

পরবর্তী কিছু ঘটনায় ঐ গুজব সত্য বলে আমার ধারণা হয়েছে। সেনাপতি হয়তো চেয়েছিলেন যে, গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে তিনি প্রধান সামরিক প্রশাসক হবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। তার এ আশাই পূরণ হলো। সামরিক শাসন জারি হবার পরপরই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী রহমত ইলাহী ঢাকায় এসে শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতে চাইলেন। ফোনে যোগাযোগ করে নিয়ে গেলাম। শেখ সাহেব চৌধুরী সাহেবের সাথে সালাম বিনিময় ও কোলাকুলি করার পরই আমাকে আক্ষেপের সাথে বললেন, "আযম সাহেব, যদি আমার সামান্য সন্দেহও হতো যে, মার্শাল ল' হবে, তাহলে আমি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতাম।" আমি বললাম "গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন হবে বলে মাওলানা মওদূদী নিশ্চিতভাবেই আপনাকে বলেছিলেন।"

নেতার জন্য সবচেয়ে যে বড়ো গুণটি অপরিহার্য তা হলো দূরদর্শিতা বা দূরদৃষ্টি। শেখ সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের অনেক গুণাবলি থাকলেও এর অভাব ছিলো সুস্পষ্ট। গোল টেবিল বৈঠকে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেলে আমি মাওলানা মওদূদীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি আরো একবার শেখ সাহেবের সাথে কথা বলতে চান কি-না। আমার পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখে তিনি বললেন, গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে গণতন্ত্র হাতে পেয়েও খোয়াতে হবে এটুকু দূরদৃষ্টি যার নেই তার সাথে আলাপ অর্থহীন। পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানীর সৃষ্ট সমস্যাই তার নিকট প্রধান। জনগণকে বুঝিয়ে সাথে নেবার যোগ্যতা না থাকলে নেতৃত্বের জন্য সত্যিই কঠিন সমস্যা। জনগণের আবেগকে সঠিক পথে পরিচালনা করা নেতার দায়িত্ব। গণআবেগে ভেসে যাওয়া নেতার কাজ নয়। সত্যিকার জনমত তাই–যা নেতা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। মিছিলের শ্লোগান দ্বারা যে পরিচালিত হয় সে সত্যিকার নেতা নয়। যোগ্য নেতাই জনগণের মুখে শ্লোগান তুলে দেয়। আমাদের দেশে এ জাতীয় নেতার বড়োই অভাব।"

১৯৭০-এর নির্বাচন

সেনাপতি ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবকে ধোঁকা দিয়ে সামরিক শাসনকর্তা সেজেই টের পেলেন যে, নির্বাচন বিলম্বিত করলে তার পক্ষে গণআন্দোলন সামলানো সম্ভব হবে না। '৭০-এর ১ জানুয়ারি থেকেই প্রকাশ্য রাজনীতি ও নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হলো। ঢাকায় জনসভার জন্য তখনও ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানই সবচেয়ে উপযোগী ছিলো। সর্বপ্রথম আওয়ামীলীগ ১১ জানুয়ারি বিরাট নির্বাচনী সমাবেশ করে। ১৮ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশও বেশ বড়োই ছিলো। কিন্তু বাম সন্ত্রাসী শক্তি আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় জনসভা বানচাল করার জন্য আক্রমণ চালালো। পল্টন ময়দানের চারদিকে দেয়াল ছিলো এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে দুটো গেট ছিলো। বাইরে থেকে ইট-পাথর মেরেও সভা ভাঙতে না পেরে পশ্চিমের প্রধান গেট দিয়ে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলো। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধ ভেঙে ময়দানে প্রবেশ করতে তারা ব্যর্থ হলো। ঘন্টা দুয়েক পর গেটে একদল পুলিশ দেখা গেলো, তখন স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সরিয়ে আনা হলো। বিস্ময়ের বিষয় যে, পুলিশ বিরাট সন্ত্রাসী বাহিনীকে বিনা বাধায় গেটে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিলো। জানা গেলো যে, তখন ঢাকার ডি.সি. ছিলো এক কাদিয়ানী।

'৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বরে। দুনিয়ার কোথাও এতো দীর্ঘদিন নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলে না। '৭০-এর জানুয়ারি থেকে গোটা বছরটাই ছিলো নির্বাচন অভিযানের বছর।

পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় সংসদের ১৬২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬৫টি আসনে জামায়াত প্রার্থী দেয়। আওয়ামীলীগ ছাড়া কোনো দলই সব আসনে প্রার্থী দেয় নি। নির্বাচনের কাছাকাছি সময়ে প্রায় সব দলই নির্বাচনী ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। জামায়াত যে কয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তার মধ্যে প্রায় দু' তৃতীয়াংশ আসনেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মোট ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনই আওয়ামীলীগ দখল করে। একটি আসনে জনাব নুরুল আমীন ও আর একটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজা ত্রিদিব রায় জয়লাভ করেন।

'৭০-এর নির্বাচন সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় নি। '৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে গণতন্ত্র হত্যা করল। '৭০ সাল পর্যন্ত যারা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখলো তারা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকেও গোলাম বানিয়েই রাখলো। কিন্তু তারা যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা ছিলো সেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বেশি তীব্র হওয়ারই কথা। তাই '৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্য ছিলো কেন্দ্রীয় সরকার দখল করা। এ জযবা সৃষ্টি হলো যে, ২৪ বছর পশ্চিম পাকিস্তানীরা কর্তৃত্ব করেছে। এমনকি জনগণের ভোটে ২৪ বছরে একবারও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচন হলো না, এবার যখন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাওয়া গেলো তখন পাকিস্তানের ক্ষমতা বাঙালি নেতাদের হাতেই তুলে দিতে হবে। এ জযবা অস্বাভাবিক ছিলো না।

নির্বাচনী সফরে বহু স্থানে আল্লাহর আইনের সমর্থক কিছু লোকও আমাকে বলেছে যে, এবার আমরা ভোট দেবো বাঙালির হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা দেবার জন্য। সামনের নির্বাচনে ইসলামের জন্য ভোট দেবো। আপনাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতা বাঙালি নয়। আপনাদেরকে ভোট দিলেও আসল কর্তৃত্ব বাঙালিদের হাতে আসবে না। আপনাদের প্রার্থী সবার চেয়ে যোগ্য সৎ বলে স্বীকার করি। কিন্তু এবার আপনাদেরকে দেবো না।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াত বনাম আওয়ামীলীগ

নির্বাচনী জনসভায় জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যের মধ্যে যেসব পয়েন্ট জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করা হয় তা নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর আইন ছাড়া মানুষের জীবনে শান্তি আসতে পারে না। মানুষের তৈরি মনগড়া বিধান দ্বারা দেশের সমস্যার সমাধান হবে না।

২. মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়েছে। ঐ জাতীয়তা অস্বীকার করলে পাকিস্তান টিকতে পারে না। আওয়ামীলীগ ঐ জাতীয়তা অস্বীকার করে বলে তাদের হাতে পাকিস্তান নিরাপদ নয়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অযোগ্য প্রতিনিধিগণই আসল দায়ী। সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায় করা সম্ভব হবে। জামায়াত সৎ নেতৃত্ব কায়েম করেই এ অবিচারের প্রতিকার করতে চায়।

৪. আওয়ামীলীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই আছে। তাই তাদেরকে ভোট দিলে তারা পাকিস্তান শাসন করতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে তারা নির্বাচনই করছে না। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাই করবে।

৫. আওয়ামীলীগ বাঙালি জাতীয়তাকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ফলে সমগ্র পাকিস্তানে রাজনীতি করার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বাঙালি জাতীয়তার শ্লোগান নিয়ে সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও পাঠানদের এলাকায় কেমন করে রাজনীতি করবে? তাই তারা একটি প্রাদেশিক দল মাত্র।

৬. আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। ১৮ জানুয়ারি সন্ত্রাস করে পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভাকে পণ্ড করে একথাই প্রমাণ করেছে যে, তারা ক্ষমতায় গেলে যুলুম-নির্যাতনের সীমা থাকবে না।

আমি প্রায়ই জনসভায় শেখ সাহেবকে সম্বোধন করে বলেছি যে, গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব হলেও দেশ শাসন করা সম্ভব হবে না। আপনার সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতেই আপনার সরকার অচল হবে। দেশ শাসনের জন্য যে ধরনের লোক তৈরি করা দরকার তা আপনি তৈরি করেছেন বলে মনে হয় না।

শেখ সাহেব এসব কথার জবাবে জনসভায় বলতেন :

১. জামায়াতে ইসলামী ও গোলাম আযম আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, আমি নাকি ইসলাম বিরোধী এবং আমি নাকি এ দেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চাই। আপনারা এসব মিথ্যা প্রচারে কান দেবেন না।

২. আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে আছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না।

৩. ৬-দফা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্য মযবুত করবে। আমরা পাকিস্তান ভাঙতে চাই না, বরং সংহতি চাই।

জনগণ এসব কথা বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকই আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়েছে এ আশায় যে, তাদের অধিকার বহাল হবে। তাদের সমস্যার সমাধান হবে এবং পাকিস্তানের নেতৃত্ব বাঙালিদের হাতে আসবে।

ইয়াহইয়া খানের সরকার নির্বাচনে এতোটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যে বহু ভোট কেন্দ্রে চরম সন্ত্রাসী তৎপরতা চলেছে, বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টদেরকে ভোট কেন্দ্র থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য ঐ পরিবেশে সন্ত্রাস ছাড়াও হয়তো আওয়ামী লীগ বিরাট সংখ্যক আসনে বিজয়ী হতো। কিন্তু সন্ত্রাসের কারণে প্রায় সব আসনই দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং বিরাট ব্যবধানে প্রতিটি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, জনগণ আওয়ামী লীগকে গোটা পাকিস্তানের ক্ষমতার আসনে দেখতে চেয়েছে। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো ইখতিয়ার জনগণ দেয় নি। জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্যই দায়িত্ব দিয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আওয়ামীলীগ কোথাও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এ দেশের আদর্শ বলে ঘোষণা করে নি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় নি।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর

জামায়াতের নির্বাচনোত্তর পলিসি

১৯৭০-এর ডিসেম্বর নির্বাচন সম্পন্ন হলো। '৭১-এর জানুয়ারিতে লাহোরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার অধিবেশন বসলো। মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমি বললাম, রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। মাওলানা বললেন যে, তিন ভাগ হয়ে গেলো। আমি বললাম, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ভৌগলিক দিক দিয়ে অখণ্ড অবস্থানে থাকায় এখানকার বিভক্তি হয়তো সাময়িক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ভিন্ন।

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। ২৪ বছর যাদের হাতে ক্ষমতা ছিলো তারা এ বন্ধনকে মযবুত করার বদলে ক্রমাগত দুর্বল করার পরিণাম এখন সুস্পষ্ট। এখন যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছেন তাদের নিকট ইসলামের কোনো গুরুত্বই নেই। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

পাকিস্তান নামে কোনো ভূখণ্ড দুনিয়ার মানচিত্রে ছিলো না। এটা ইসলামেরই সৃষ্টি। যদি ইসলামী আদর্শ আঁকড়ে ধরা না হয় তাহলে পশ্চিম প্যাকিস্তানের ঐক্যও থাকবে না। ৪টি প্রদেশের নাম লুপ্ত করে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তান নাম রাখা হয়েছিলো। কিন্তু কয়েক বছর পরই পাঞ্জাব, সিন্ধু সীমান্ত ও বেলুচিস্তান নাম পূনর্বহাল হয়ে গেলো। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পূর্ব পাকিস্তান নামও থাকবে না।

এ অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীকে এটা ধরেই নিতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই আমার প্রস্তাব হলো যে, এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের মাজলিসে শুরাকে পূর্ণ ইখতিয়ার দেওয়া হোক যাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মাজলিসে শুরার অনুমতি বা অনুমোদনের জন্য যেনো অপেক্ষা করতে না হয়।

মাওলানা মওদূদী মজলিসে শুরার সদস্যদের ভাবভঙ্গি ও আমার বক্তব্যের পক্ষে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন তো বহু পূর্বেই জামায়াতে স্বীকৃত। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের মজলিসে শুরা ও রুকনদের পক্ষেই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। এ প্রস্তাবে বোধ হয় কারো আপত্তি নেই। সবাই একবাক্যে সম্মতি প্রকাশ করার পর আমি আরো কিছু কথা বললাম।

আমি বললাম যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবেই (Constitutional Process) হয়তো ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতার দিকে যাবে। হয়তো আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের পর প্রথমে ৬-দফা চালু করবে এবং পরিণামে পূর্ব ও পশ্চিম আপসেই আলাদা হয়ে যাবে। পশ্চিম পাকিস্তান হয়তো অর্থনৈতিক দিক দিয়েও আলাদা হওয়া ক্ষতিকর মনে করবে না। রাজনৈতিক দিক দিয়ে আলাদা হবার লক্ষণ স্পষ্ট হওয়ার আর কোনো বন্ধন বাধা দিতে সক্ষম হবে না।

'৭১-এর মার্চে ইয়াহইয়া মুজিব আলোচনা ভেঙে যাবার পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তা বিবেচনা করে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যখন যে সিদ্ধান্তই প্রাদেশিক মজলিসে শূরা গ্রহণ করেছে তা কেন্দ্রে অবশ্যই জানানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই কোনো রকম ভিন্ন মত প্রকাশ করে নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আওয়াজ যদি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে আচ্ছন্ন না হতো এবং ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব বলে যদি জামায়াত মনে করতো, তাহলে জামায়াত অবশ্যই স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো।

নির্বাচনোত্তর সমস্যা

পাকিস্তান কায়েম হবার প্রায় ২৪ বছর পর গোটা দেশে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোনো একটি রাজনৈতিক দলই সমগ্র পাকিস্তানে জনগণের সমর্থন লাভ করে না। আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়, পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়া আর কোথাও আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থীই দাঁড় করাতে সক্ষম হয় নি। যে একটি মাত্র আসনে প্রার্থী দাঁড় করালো সেখানেও কোনো পশ্চিম পাকিস্তানী প্রার্থী যোগাড় করতে পারে নি।

পাঞ্জাব ও সিন্দু প্রদেশে আইয়ুব খানের প্রাক্তন দলীয় সেক্রেটারি জেনারেল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্স পার্টি প্রায় একচেটিয়া বিজয় লাভ

করে। আর সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে ওয়ালী খানের ন্যাপ ও মুফতী মাহমুদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়।

নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতেই আসার আর পিপলস পার্টির প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করার কথা। গোটা পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র গণ্য করা হলে ৩০০ আসন বিশিষ্ট গণপরিষদে ১৬০টি আসনে বিজয়ী আওয়ামীলীগই মেজরিটি পার্টি। তাই সঙ্গতভাবেই ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। 'ভবিষ্যত' শব্দটি বলা এজন্য দরকার ছিলো যে, সরকার গঠনের পূর্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমে গণপরিষদ হিসেবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর ঐ নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার গঠিত হবার কথা। তখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কোনো লোক গণপরিষদে না থাকায় ৫টি প্রদেশের মধ্যে শুধু একটি প্রদেশের লোক দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা চলে না। প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, পিপলস পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের আর সব দলের যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে কোন্ কোন্ দলের সাথে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন হতে পারে?

পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর দল ছাড়া আর যে কয়টি দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলো তারাই শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ নিলো। কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা মিঞা মোমতায মুহাম্মাদ খান দোলতানা, ন্যাপের খান ওয়ালী খান, জমিয়তে ওলামার মুফতী মাহমুদ ও জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের শাহ আহমদ নূরানী ঢাকায় এসে শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তান যাবার দাওয়াত দিলেন। তারা শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার সাথে সরকারে যোগদান করার ইচ্ছাও ব্যক্ত করলেন। তারা এ নিশ্চয়তাও দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য যেসব দল নির্বাচনে আসন লাভ করেছে তারা সবাই ভুট্টোর বিরোধী।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে মাওলানা নূরানী আমার বাড়ীতে এসে দেখা করলে আমি জানতে চাইলাম যে, শেখ মুজিব যদি করাচি, পিণ্ডি ও লাহোরে যান তাহলে জনসমর্থন পাবেন কি-না? জনগণ ভুট্টোর চেয়ে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের নেতা হিসেবে বেশি পছন্দ করবে কি-না? তিনি জোর দিয়ে বললেন, "নির্বাচনে কম আসন পেলেও জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও

অন্যান্য ইসলামী দল, এমনকি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠনগুলোর সমর্থনে যে বিরাট সংখ্যক ইসলামপন্থী জনতা রয়েছে তারা সবাই ভুট্টোকে ইসলাম বিরোধী মনে করে। ভুট্টোর নেতৃত্ব থেকে বাঁচার জন্য সবাই শেখ মুজিবকে চায়। আমরা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।" একথা শুনে আমিও তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিলাম।

কিন্তু বামপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে দিলো না। তারা ভয় দেখালো যে, সেখানে গেলে শেখ মুজিবকে হত্যা করে ফেলবে অথবা চাপ দিয়ে এমন দাবি আদায় করে নেবে যার ফলে ৬-দফা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে সামরিক শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সবকিছুই করবে।

শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো বিরোধী নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় ভুট্টো ধারণা করলেন যে, শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কারণে জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যাতে গ্রহণ না করে সে উদ্দেশ্যে ভুট্টো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। শেখ মুজিবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভুট্টোই সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্নতার উদ্যোগ নেন। তিনি শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে বলেন, "এধার হাম, ওধার তুম"।

মি. ভুট্টো এক রাষ্ট্রে দুটো মেজরিটি পার্টির অদ্ভুত তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি দাবি করেন যে, শেখ মুজিব পূর্বে এবং তিনি পশ্চিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এ দাবি দ্বারা তিনি সুস্পষ্টভাবেই পাকিস্তানকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নিলেন। ভুট্টোর এ দাবি সমস্যা আরো জটিল করে তুললো।

এ সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আমি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বারবার ভুট্টোর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে থাকলাম এবং শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বেই শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার দাবি জানাতে লাগলাম। আমার এ বিশ্বাস ছিলো যে, ক্ষমতা হাতে পেলে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের জনসমর্থন পাবেন এবং ভুট্টোর বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র থেকে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে সমর্থ হবেন।

ইয়াহইয়া খান '৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহবান করলেন। ভুট্টো বিরোধী দলের ভূমিকার বদলে ক্ষমতায় অংশীদার হবার হীন উদ্দেশ্যে হুমকি দিলেন যে, তার সাথে শেখ মুজিবের বোঝাপড়ার আগে গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি যোগদান করবেন না। এমনকি সন্ত্রাসী ভাষায়

তিনি ঘোষণা দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো সদস্য ঢাকা রওয়ানা হতে চেষ্টা করলে করাচি বিমান বন্দরে তার পা ভেঙে দেওয়া হবে।

ইয়াহইয়া খান ঢাকায় এলেন এবং শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে গিয়ে করাচি থেকেই লারকানায় গিয়ে ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে ১ মার্চ ঘোষণা করলেন যে, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের অধিবেশন মুলতবী করা হলো। এখান থেকেই সংকট চরম রূপ লাভ করলো।

শেখ মুজিব যা করতে পারতেন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে নিয়ে জনগণের স্বার্থ যথাযথভাবে হাসিল করার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পৃথক করার পরিকল্পনা থাকলে শেখ মুজিব নির্বাচনের পর বিজয়ী বেশে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যেতেন এবং ভুট্টো বিরোধী সকল দলকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতেন। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মর্যাদা নিয়ে দাপটের সাথেই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে হাযির হয়ে ইয়াহইয়া খানের সাথে শাসনতন্ত্র রচনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ঐ পরিস্থিতিতে ভুট্টো বিরোধী নেতৃবৃন্দ তাঁর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতো এবং তাঁর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতো। কিন্তু এ জাতীয় কোনো পরিকল্পনা তার ছিলো বলে সামান্য প্রমাণও মিলে না।

যদি বাংলাদেশকে পৃথক করার পরিকল্পনা থাকতো তাহলে নির্বাচনের পর পরই যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিলো তাও তিনি করলেন না। নিতান্ত গো-বেচারা ধরনের গভর্ণর আহসানের সহযোগিতা নিয়ে তিনি ইয়াহইয়া খানকে প্রথমেই স্পষ্ট ভাষায় জানাতে পারতেন যে, নির্বাচনের ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানী কোনো নেতার ওপর আস্থা রাখে না। তাই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখায় কারো কল্যাণ হবে না। আসলে দুটো বন্ধুদেশ হিসেবে পৃথক হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করাই সময়ের দাবি।

প্রথমেই এ পদক্ষেপ নিলে পূর্ব পাকিস্তানে এমন সামরিক শক্তি ছিলো না যা ২৫ মার্চের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো। তখন রাজনৈতিক উপায়েই সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হতো। নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের দাওয়াত সত্ত্বেও সেখানে সফরে না যাওয়া এ সন্দেহ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক যে শেখ মুজিব দেশকে বিভক্ত করতে চান। অথচ সে পরিকল্পনাও যে তাঁর ছিলো না সে কথা অত্যন্ত স্পষ্ট।

তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন বলেই একদিকে ইয়াহইয়া খান ২/৩ মাস সময় হাতে পেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সশস্ত্র বাহিনীর লোক এনে বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পেলো। অপরদিকে দেশের বামপন্থী ও ভারতপন্থী শক্তি জাতীয় নেতার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াই বিচ্ছিন্ন হবার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। এ সংঘর্ষের পরিণামে জনগণকে চরম বিপদে পড়তে হয়েছে।

৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য গণপরিষদের অধিবেশন মুলতবী করার ঘোষণা ১ মার্চ রেডিওতে প্রচারের সাথে সাথে বাম ও ভারতপন্থী কিছু যুব নেতার উদ্যোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বিক্ষুদ্ধ জনতাকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও অফিস থেকে বের হয়ে পড়লেন। তারা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বদলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের মর্যাদায় নামিয়ে আনলেন। শেখ মুজিব তাদের পরামর্শে সরকারী হুকুম জারি করা শুরু করলেন।

শেখ মুজিব এটাকে অসহযোগ আন্দোলন বলে ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এটা ছিলো বিকল্প সরকার গঠন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করারই চেষ্টা করলেন। তারই নির্দেশে ব্যাংককে চলতে হতো। এমন পরিকল্পিত ও আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত কোনো দূরদর্শী নেতা নিতে পারে না।

জনতার মিছিল, বিক্ষুদ্ধ কর্মীদের আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে বিনা পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যোগ্য নেতার ভূমিকা হতে পারে না। জনগণ যাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানাবার জন্য এতো উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ভোট দিলো তিনি প্রাদেশিক সরকার দখলের হাস্যকর ভূমিকা পালন করলেন। গণআন্দোলনের লাগাম কষে তাঁকে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করাই হলো যোগ্য নেতার কাজ। নেতা পরিচালিত হয় না। পরিচালনা করে।

বিদ্যুত বিরাট এক শক্তি। বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে সে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহার না করলে এ শক্তি কল্যাণ করতে সক্ষম হয় না। গণআন্দোলন, গণজোয়ার ও গণবিপ্লব তেমনি এক বিরাট শক্তি। সাংগঠনিক উপায়ে এ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বিনা ক্ষতিতে উদ্দেশ্য সফল হয়।

ইয়াহইয়া-মুজিব বৈঠক

১৯৭১-এর ১ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার অচল হয়ে পড়লো। শেখ মুজিব বিকল্প সরকার কায়েম করার প্রহসন চালালেন। সশস্ত্র বাহিনী সেনানিবাসে আটকে রইলো। জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করা হলেও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করলেন।

এ পরিস্থিতিতে ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য ঢাকায় এলেন। ১৯ মার্চ বৈঠক শুরু হলো। আলোচনা সন্তোষজনক বলে পত্রিকা ও রেডিওতে প্রচার করা হচ্ছিলো। ইয়াহইয়া খানের সাথে আলোচনায় শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই তাঁর পক্ষ থেকে কথা বলার দায়িত্ব পালন করতেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সৈয়দ সাহেব ঢাকায় এলে প্রায়ই তার সম্বন্ধী ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেবের মগবাজারস্থ বাড়ীতেই উঠতেন। ইয়াহইয়া-মুজিব বৈঠক চলাকালেও তিনি ঐ বাড়ীতেই থাকতেন।

ঘটনাক্রমে আমার বাড়ী ঐ পাড়ায়ই। মাত্র ৩টি বাড়ী মাঝখানে। বৈঠক চলাকালে তিনি অনেক রাতে যখন ফিরতেন তখন তাঁর কাছ থেকে সামান্য কিছু খবর পেতাম। আমার ছাত্র জীবনের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তিনি খোলা মনেই বলতেন যে, গোপনীয়তা রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ না থাকলে অনেক কিছুই বলতাম। আমিও বন্ধুত্বের দাবিতে বেশি কিছু জানার চেষ্টা করতাম না।

আমার ঐকান্তিক উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, এ বৈঠক যেনো সফল হয়। ব্যর্থ হবার মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে ধারণা থাকার কারণেই সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকে শুধু এটুকু জানার চেষ্টা করতাম যে, সমঝোতার পথে অগ্রগতি হচ্ছে কি-না। প্রথমদিকে সম্ভাবনার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ২১ তারিখ দিবাগত রাতে যখন দেখা করতে গেলাম তখন তার বিষন্ন চেহারা দেখে অবস্থা আঁচ করে তার দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, ভাই আযম সাহেব আমরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। ৬-দফার ভাষা ঠিক রেখে এমনভাবে শাসনতন্ত্রের খসড়া আমরা রচনা করেছি যাতে পাকিস্তানও টিকে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবিও পূরণ হয়। যদি গোপনীয়তা রক্ষার শপথ না নিতাম তাহলে সে খসড়া আপনাকে দেখাতাম।

তাঁর মুখে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে এমন বলিষ্ঠ কথা শুনে আমি বললাম, কোনো অবস্থায়ই আলোচনা ভেঙে দেবেন না। শেখ সাহেবের পেছনে যখন বিরাট গণসমর্থন আছে তখন বুদ্ধিমত্তার সাথে আপনারা যতোটুকুই আদায় করতে পারেন তা নিয়েই সমঝোতা করে নিলে ক্ষমতায় গিয়ে বাকী সবই করাতে পারবেন।

তিনি বললেন, ইয়াহইয়া ভুট্টোকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস পান না। তাই এ সময় তাকেও ঢাকায় উপস্থিত রেখেছে। অপরদিকে মাওলানা ভাসানী ও অন্যান্যরা ময়দানে হৈ চৈ করছে যাতে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের একদল তো শেখ সাহেবকে বৈঠকে বসতেই বাধা দিয়েছে। তিনি তা উপেক্ষা করেছেন।

শেখ সাহেব সামান্য নমনীয় হলে এরা বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ে খেলবে। ভুট্টো যা চায় তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যা চাই তা ভুট্টোর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ইয়াহইয়াও এগুতে চায় না। আল্লাহই জানেন শেষ পর্যন্ত কী হবে।

আমি পেরেশান হয়ে বললাম সৈয়দ সাহেব, শেখ সাহেবকে যে কোনো মূল্যে সমঝোতা করতে আপনারা রাযী করতে পারবেন না? তিনি চুপ করে রইলেন। আমি অস্থিরতা প্রকাশ করে বললাম এ আলোচনা ভেঙে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ সংকট কাটিয়ে দেশকে বিপর্যয় থেকে একমাত্র শেখ সাহেবই রক্ষা করতে পারেন। আবেগের সাথে বললাম যে, আমাকে শেখ সাহেবের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেন? তিনি বললেন, চেষ্টা করবো।

পরদিন ২২ তারিখেও বৈঠক হলো। কিন্তু নজরুল সাহেবের সাক্ষাত আর পাই নি। শেখ সাহেবের সাথেও সাক্ষাতের সুযোগ হয় নি।

২৫ তারিখ সকাল ১০টায় সাইন্স ল্যাবরেটরির নিকটস্থ জনাব আবদুস সামাদের (তখন তাঁর নামে আযাদ শব্দ যুক্ত ছিলো না) বাসায় আলোচনা থেকে এটুকুই বুঝলাম যে বৈঠক সফল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এখন অপর পক্ষ কী করে দেখা যাক। তাঁর কাছ থেকে এমন কোনো আশঙ্কার আভাস পাই নি যা ঐ দিনগত রাতেই ঘটলো। নজরুল সাহেবকে না পেয়ে সামাদ সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনিও আলোচনার দ্বিতীয় টীমের সদস্য ছিলেন বলে জানতাম। নূরুল আমীন সাহেবের পি.ডি.পি-এর প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসেবে পি.ডি.এম-এর তিনি ট্রেজারার থাকাকালে তার সাথে যে ঘনিষ্ঠতা ছিলো সে সূত্রেই তার সাথে দেখা করেছিলাম।

পূর্ব পরিকল্পনাবিহীন আলোচনা

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান, না শুধু বাংলাদেশের কর্তৃত্ব চান সে বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিলো না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম থেকে যতোটুকু জেনেছি তাতেও স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, তিনি এভাবে বাংলাদেশকে তখনই আলাদা করতে চান নি। তিনি ২৫ মার্চ গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু সহকর্মীদেরকে কোনো সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করছেন বলেও জানা যায় না।

ইয়াহইয়া খানের সাথে আলোচনা ভেঙে যাবার কী মারাত্মক পরিণতি হতে পারে এর কোনো ধারণা তাঁর ছিলো বলে বোঝা যায় না। তিনি সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন। সহকর্মী ও দেশবাসীকে ইয়াহইয়া ও টিক্কা

খানের গুলির মুখে ফেলে গেলেন। তাঁর সহকর্মীরাও ভারতে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পেলেন। কিন্তু জনগণের কি গতি করে গেলেন?

১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি ভোটারদেরকে নিশ্চয়তা দান করেছেন যে, তিনি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চান না। সুতরাং দেশ ভাগ করার কোনো ম্যান্ডেট তিনি জনগণ থেকে চান নি।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশ যে প্রদেশে বাস করে সে প্রদেশের নির্বাচিত নেতা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হাতে নেবার প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মকৌশল অবলম্বন করা তাঁরই পবিত্র দায়িত্ব ছিলো।

ইয়াহইয়া খানের সাথে আলোচনা কেনো ব্যর্থ হলো, তিনি সংকটের কী সমাধান বৈঠকে পেশ করেছিলেন, অপরপক্ষের দাবি বা প্রস্তাব কী ছিলো; যা তার পক্ষে কবুল করা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করলেন ইত্যাদি সম্পর্কে দেশবাসীকে তিনি কিছুই জানতে দেন নি। তখন পত্রিকা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলো। তিনি ২২ মার্চ শেষ বৈঠকের পর ২৩ ও ২৪ তারিখের মধ্যে তার সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে এবং আলোচনা ভেঙে যাবার কারণ উল্লেখ করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার কোনো ঘোষণাও দিলেন না।

এতোবড়ো একটা বিষয়ে সবাইকে অন্ধকারে রেখে তিনি গ্রেফতার হয়ে গেলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তার আর সব সাথীদের মতো তিনিও ভারতে আশ্রয় নিতে পারতেন।

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে টিক্কা খানের মতো যুদ্ধবাজ মোটা মাথার জেনারেল গণহত্যা এবং পুলিশ ও ই.পি.আর (বর্তমান বি.ডি.আর) হেড কোয়ার্টারে হামলা করায় মুক্তিযুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়। এসব না করে সেনাবাহিনী কারফিউ জারি করে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করলে সেনাবাহিনীর বাঙালী অফিসার, পুলিশ ও ই.পি.আর বিদ্রোহের পথ বেছে নিতো না।

ওদিকে রাজনীতিতে চরম অনভিজ্ঞ ইয়াহইয়া খানও শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনা ভেঙে যাবার ব্যাপারে দেশবাসীর নিকট কোনো ব্যাখ্যা পেশ না করে টিক্কা খানকে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ জয় করার লাইসেন্স দিয়ে দিলেন। টিক্কা খানের আর্মি-এ্যাকশনকে যুক্তিসম্মত প্রমাণ করার জন্য এ দেশের জনগণের নিকট কোনো বক্তব্যও ইয়াহইয়া খানের পক্ষ থেকে পেশ করা হলো না।

আর কিছু না হোক যদি শেখ মুজিব গ্রেফতার হবার পূর্বে আলোচনা ব্যর্থ হবার বিশ্লেষণসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দিতেন তাহলে এ বিতর্কেরও অবকাশ

থাকতো না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে। আর জনগণের মধ্যে ঐ সময়কার পরিস্থিতি কি স্বাধীনতা-যুদ্ধ না গৃহযুদ্ধ সে নিয়েও কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো না।

আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো পরিকল্পনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। '৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোর বিমান বন্দরে শেখ সাহেবের উকিল প্রখ্যাত আইনজীবি এ. কে. ব্রোহী আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করলেন যে, শেখ মুজিব দেশকে বিভক্ত করতে চান না। ব্রোহী সাহেব ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর উকিল হিসেবে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে বেআইনী ঘোষণার বিরুদ্ধে মামলায় বিজয়ী হওয়ার পর থেকে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়। তাই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমাকে এ ধারণা দিতে চেষ্টা করলেন যে, মক্কেল কখনো উকিলের কাছে মনের কথা গোপন করে না। তার মতে শেখ মুজিব ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর ক্ষমতা লিপ্সার শিকার।

যদি একথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে শেখ মুজিবের উচিত ছিলো ইয়াহইয়া-ভুট্টোর মুখোশ খুলে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের সমর্থন কামনা করা। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসেই তিনি তা করতে পারতেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভুট্টো বিরোধী পশ্চিম পাকিস্তানী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ তাকে সাদরে বরণ করে নিতো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কারা দিয়েছেন?

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জেনারেল ওসমানী ও তার সেক্টর কমাণ্ডারগণই স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ময়দানে তাদের নেতৃত্বেই মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম করেছে। আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডের জেনারেল আরোরা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দকে সমর কৌশলের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন এবং শেষ পর্যায়ে নিজেরাই যুদ্ধে নেমে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছেন।

আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দকে ভারত সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। কলকাতায় বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার হিসেবে তাদেরকে সামনে রেখে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। ঐ সময়ই রুশ-ভারত সহযোগিতা চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে। ইন্দিরা গান্ধি স্বয়ং আমেরিকা ও বৃটেন সফর করে আন্তর্জাতিক ময়দানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সংগঠিত করেন।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইন্দিরা গান্ধি, ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরিকল্পনা ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো না। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। পাকিস্তানকে বিভক্ত করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো।

ইয়াহ্ইয়া-টিক্কার অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের কারণেই ভারত এতোবড়ো সুযোগ পেয়ে গেলো। অবিবেচনা প্রসূত আর্মি এ্যাকশন হিন্দু জনগণকে বিরাট সংখ্যায় ভারতে যেতে বাধ্য করলো। মুসলিম জনগণ জীবন রক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে যায় নি। হিন্দুদের উপর হামলা হবার কারণেই তারা যেতে বাধ্য হলো। মুসলমানদের মধ্যে যারা গিয়েছেন তারা শুধু রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনেই গিয়েছেন।

১৯৭১-এর সংকট সৃষ্টির জন্য কারা দায়ী?

'৭১-এর সংকট সম্পর্কে যাবতীয় ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে ভুট্টোই এক নম্বর দোষী। ইয়াহ্ইয়া খান অবশ্যই দু-নম্বর অপরাধী।

এক দেশে দুটো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অদ্ভূত দাবি তুলে ভুট্টো যদি ক্ষমতার নেশায় পাগল না হতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে '৭১-এর সংকট কখনও সৃষ্টি হতো না। গণপরিষদের অনুষ্ঠিতব্য ৩রা মার্চের প্রথম অধিবেশনে ভুট্টো যোগদান করতে রাযী হলে গণতান্ত্রিক পন্থায় শাসনতন্ত্র রচনা করে সে অনুযায়ী কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকার গঠন করা সম্ভব হতো।

ক্ষমতা লিপ্সু ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের বাদশাহ হবার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে ধাক্কা মেরে আলাদা করা অপরিহার্য মনে করলেন। তিনি জানতেন যে তার নিকট এমন কোনো আদর্শ ও সংগঠন নেই যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাজারে তাঁর পক্ষে সামান্য একটু চাহিদাও সৃষ্টি করতে পারে। তাই পূর্ব-পশ্চিম এক রাষ্ট্র থাকলে কোনো কালেই তার ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া ২৪ বছরে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা হতে দেওয়াই স্বার্থের বিচারে বুদ্ধিমানের কাজ। এক থাকলে পূর্ব পাকিস্তান তার অধিকার আদায় করেই ছাড়বে। তাই সে সুযোগ না দেওয়াই উচিত। এ মনোভাব আরও কোনো দলের ছিলো কি-না জানি না। কিন্তু ভুট্টো ও তার দলের এ দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৭২ সালে আমার বাধ্য হয়ে পাকিস্তানে আটকে পড়ে থাকাকালে স্পষ্ট অনুভব করেছি।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তান দখল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলো তখন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পোল্যান্ডের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

তখন মুক্তিযুদ্ধ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে অবশ্য এ প্রস্তাব বাস্তবসম্মত ছিলো না। কিন্তু এ বিষয়টা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়েছে ভুট্টোর ঘৃণ্য ভূমিকা প্রমাণ করার জন্য। ঐ সময় ভুট্টো ইয়াহ্ইয়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পোল্যান্ডের প্রস্তাব লিখিত কাগজটি একজন যোগ্য অভিনেতার ভঙ্গিতে সাধারণ পরিষদে ছিড়ে ফেলে ঘোষণা করলেন যে, প্রয়োজনে হাজার বছর যুদ্ধ করবো তবু এমন অপমানকর প্রস্তাব মেনে নেবো না। অথচ এ ভুট্টোই ১৯৭৩ সালে চরম অপমানকর সিমলা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এলেন। আজ ঐ সিমলা চুক্তির ফলেই পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুকে কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে পেশ করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। কাশ্মীরী জনগণের গণভোটের অধিকার ঐ চুক্তি দ্বারা খতম করে দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ৪৮ সালে এ অধিকার দিয়েছিলো। আর ৭৩ এ ভুট্টো তা নস্যাৎ করে দিলেন।

ভুট্টোর এসব আচরণই প্রমাণ করে যে ৭১-এর দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য তিনিই প্রধানত দায়ী।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় ইয়াহ্ইয়া খান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে ক্ষমাহীন অযোগ্যতার প্রমাণ দিলেন সে জন্য তিনি নিঃসন্দেহে অপরাধী। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকার কথা নয়। তা থাকলে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ করার জন্য শেখ মুজিবকে সুযোগ করে দিতেন না। আইয়ুবের পতনের পর রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার লোভই তাকে কুপথের দিশা দিয়েছে। ভুট্টোর মতো ধুরন্ধরকে নিয়ন্ত্রণের কোনো যোগ্যতাই তার ছিলো না। ভুট্টো দেশকে বিভক্ত করতে না চাইলে ইয়াহ্ইয়া খান নিজকে ইতিহাসে এমন ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ করতো না বলেই অনেকেরই ধারণা। এ কারণেই ঐ বিপর্যয়ের জন্য ভুট্টোর পরেই ইয়াহ্ইয়া খানকে দায়ী করতে হচ্ছে।

শেখ মুজিব সম্পর্কে আমার আগাগোড়াই এ ধারণা ছিলো যে, তিনি যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কোনো পরিকল্পনা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে, এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন যা তাকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে স্বাধীন হওয়ার পথ সহজেই বের করতে পারবেন বলে তাঁর ধারণা ছিলো।

কিন্তু তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যা করা উচিত ছিলো তা করার সাহস কেনো পেলেন না তা সত্যিই দুঃখজনক। নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এসে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার অনুরোধ তার লুফে নেওয়া প্রয়োজন ছিলো। সেখানে গেলে দেখতে পেতেন যে, ভুট্টোর স্বৈরশাসন থেকে বাঁচার জন্য আর সব রাজনৈতিক দল ও সমাজতন্ত্র বিরোধী জনগণ তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরম উৎসাহ সহকারে বরণ করে নিচ্ছে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ছোটো ছোটো দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে কোয়ালিশন করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হাতে নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করলে ভুট্টোর পক্ষে টু-মেজরিটি পার্টির ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করা সম্ভব হতো না।

৭১-এর পরিস্থিতি ও জামায়াতের বিশ্লেষণ

জামায়াতে ইসলামী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪১ সাল থেকে সংগ্রাম করছে সে আদর্শের আলোকেই ১৯৭১-এর অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ করে নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মজলিসে শুরা সর্বসম্মতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

১. নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পর্যায়ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার পক্ষে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় ১৯৭১-এর জানুয়ারি মাসেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব জামায়াত গ্রহণ করে নি। কিন্তু যদি আওয়ামীলীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেবার পর এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে জামায়াত-এর কোনোরূপ বিরোধিতা করবে না বলেই সিদ্ধান্ত ছিলো।

২. জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন কখনোই মনে করে নি। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের জনগণের সর্বমোট সংখ্যা থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি ছিলো। গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জনই পূর্ব পাকিস্তানের ছিলো। এ সংখ্যার অনুপাতেই পাকিস্তান জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ৪টি প্রদেশের মোট আসন সংখ্যা ছিলো ১৩৮। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কোনো নযীর নেই যেখানে সংখ্যাগুরু এলাকা সংখ্যালঘু এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছে।

৩. জামায়াত একথা বিশ্বাস করতো যে, কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা যদি সৎ, যোগ্য ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করে তাহলে পূর্ব

পাকিস্তানের অধিকার যথাযথরূপে আদায় করা সম্ভব। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ব্যবস্থা করা হয়। আইয়ুব আমলে পূর্ব ও পশ্চিমের সমান সংখ্যক সদস্য ছিলো। অবশ্য পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদেও পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিলো। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পূর্ব পাক প্রতিনিধিগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৪. ১৯৪০ সালে লাহোরে শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের পেশকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালেই পূর্ব পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করতে পারতো। তাহলে ১৯৭১-এর সংকট সৃষ্টিই হতো না। কিন্তু '৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকেটে গোটা ভারত থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রবাদ পুরুষ জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তাব পেশ করেন। কায়েদে আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে এ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়। ভারতের দুশমনীর মোকাবিলায় শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে তোলার যুক্তি দেখিয়েই এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

৫. জামায়াত একথাও বিশ্বাস করতো যে, ভারতের দু'প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থানের দরুন উভয় এলাকা ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকাই সমর কৌশলের দিক দিয়েও অধিকতর যুক্তিপূর্ণ।

৬. ১৯৭১-এ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ভারতের অভিভাবকত্ব স্বীকার করা ছাড়া পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো উপায় ছিলো না। এ কারণেই আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ভারতের নেতৃত্বে প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে বলে জামায়াত মোটেই বিশ্বাস করতে পারে নি। পাকিস্তানের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভারতের আধিপত্য কায়েম হবার আশঙ্কা-ই জামায়াতকে সবচেয়ে বেশি পেরেশান করেছিলো।

৭. জামায়াতের নিকট আদর্শিক সংকট মারাত্মক আকারে দেখা দিলো। ইসলামের নামেই এ ভূখণ্ডটি ভারত থেকে আলাদা হয়েছিলো। এ সত্ত্বেও নেতাদের মুনাফিকীর কারণে ইসলামী আদর্শের লালন না করায় আদর্শিক শূন্যতা দেখা দিলো। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র আদর্শিক ময়দান দখল করতে চাইলো এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান শ্লোগানে পরিণত হলো। ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব মতবাদকে সমর্থন করা জামায়াতের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ এতে ঈমানের প্রশ্ন জড়িত।

৮. আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জনগণের নিকট ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে ইস্যু বানানো হয় নি। এসব বিষয়ে ভোটাররা শেখ মুজিবকে কোনো ম্যান্ডেট দেয় নি। ১৯৭১-এর ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত যাদের নেতৃত্বে ময়দান গরম করা হচ্ছিলো তারা জনগণের নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ ৬-দফার ভিত্তিতে অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জননেতা শেখ মুজিবের পরিকল্পনা ও নির্দেশ ছাড়াই ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ঢাকায় সর্বত্র পাকিস্তানী পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। অথচ এ পতাকা শেখ মুজিব বা আওয়ামীলীগ ডিজাইন করে নি। এ পতাকার উদ্ভাবক ও প্রথম উত্তোলনকারী হবার দাবিদার যিনি তিনি আর যা-ই হোন ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নমীনি ছিলেন না।

এটা বড়োই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একটা দেশের কিসমতের ফায়সালা এবং সে দেশের আদর্শ ও পতাকার সিদ্ধান্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 'ফরমালী' আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করেন নি। রাজপথে শ্লোগানদাতাগণের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছে।

৯. দেশের জনগণ ১৯৭১-এর আগে এবং পরে কোনো সময়ই ভারতকে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে নি। ভারতের কাছ থেকে ১৯৪৭-এর পর থেকে এ পর্যন্ত যে আচরণ পাওয়া গেছে তাতে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। ১৯৭১-এ ভারতের ভূমিকা যা ছিলো তাও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে বলেই জনগণ মনে করে। জামায়াত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি যে, ভারতের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন হবার পর এ আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ভারত এদেশে এমন লোকদেরকেই ক্ষমতায় দেখতে চাইবে যারা তার আধিপত্য মেনে চলবে। ফলে সত্যিকার স্বাধীনতা কতোটুকু লাভ হবে তা একেবারেই অনিশ্চিত।

১০. জামায়াতের এ বিষয়েও প্রবল আশঙ্কা ছিলো যে, যাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বানাবার প্রচেষ্টা চলছে তারা ক্ষমতাসীন হলে তাদের প্রধান টার্গেটই হবে ইসলাম। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পথ তারা চিরতরে রুদ্ধ করার ব্যবস্থা করবে। ভারতের তাবেদারী করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকবে না। ভারতের সাথে আদর্শিক দূরত্ব দূর করাই তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণামে এ দেশের স্বাধীন সত্তা হারাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

জামায়াতের সামনে ৩টি পথ ছিলো

আদর্শভিত্তিক সংগঠন হিসেবে জামায়াতের মজলিসে শুরায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনটি পথের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করা সম্ভব ও সমীচীন তা বিবেচনা করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছে। পথ তিনটি হলো :

১. আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া।

২. সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে নিষ্ক্রিয় হয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা।

৩. পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যুলুম থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা এবং জনগণকে ভারতের আধিপত্য সম্পর্কে সাবধান করা।

প্রথম পথটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য ছিলো না :

(ক) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে আদর্শিক কারণেই সহযোগিতা করা সঠিক হতো না।

(খ) আওয়ামীলীগ নেতাদের মতো জামায়াত নেতাদের ভারতে আশ্রয় নেবার চিন্তা করাও সম্ভব ছিলো না।

(গ) ভারতের হাতে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তুলে দেবার মতো মনোভাব জামায়াতের থাকার কথা নয়।

(ঘ) জামায়াত এটাকে অনিশ্চিত পথ মনে করেছে বলে এ পথে যেতে পারে নি।

(ঙ) যেটুকু স্বাধীনতা আছে ভারতের আধিপত্যে তাও হারাবার আশঙ্কাই জামায়াত করেছে।

দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বাস্তবেই অসম্ভব। রাজনীতিতে নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ নেই। রাজনীতি না করার সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো নিরপেক্ষ থাকা যায়। জামায়াত একটি আদর্শবাদী আন্দোলন এবং সুশৃঙ্খল সংগঠন। সংগঠনের হাজার হাজার কর্মীকে কাজ না দিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখার মানে সংগঠন ভেঙে দেওয়া। ১৯৭০-এর নির্বাচনে যে ১২ লাখ লোক জামায়াতকে ৬৫টি আসনে ভোট দিয়েছে তারা ঐ পরিস্থিতিতে কী করবে তার পথনির্দেশনা জামায়াতের কাছে ছাড়া আর কার কাছে চাইবে? এসব কারণে জামায়াতের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা স্বাভাবিক ছিলো না। তাই জামায়াত একমাত্র বিকল্প পথ হিসেবে যা করা কর্তব্য তাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯৭১-এ যা ঘটেছে

১৯৭১-এ যা ঘটেছে এর দুটো দিক রয়েছে :

১. রাজনৈতিক দিক। ২. মানবীয় দিক।

রাজনৈতিক দিকের বিবরণ হলো এই যে, কয়েকটি রাজনৈতিক দল ভারতের অভিভাবকত্বে ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা এ সংগ্রামকে স্বাধীনতা আন্দোলন মনে করেছে।

আর কতক দল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকাকে পরাধীনতা মনে করে নি। বরং ভারতের সাহায্যে আলাদা হওয়ার দ্বারা পরাধীন হবার আশঙ্কাই তারা করেছে।

এ দু' পক্ষের কোনো পক্ষকেই দেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলার উপায় নেই। একপক্ষ স্বাধীনতার প্রয়োজনেই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জরুরি মনে করেছে। অপরপক্ষ স্বাধীনতার স্বার্থেই বিচ্ছিন্ন না হওয়া উচিত বলে বিশ্বাস করেছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্য আদর্শিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

যারা বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ছিলো তারা ঐ মুসলিম জাতীয়তাবোধকে বিসর্জন দিয়েছে যা এ ভূখণ্ডটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছে। তারা ঐ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করেছে যা ভারত বিভক্তির বিরোধী ছিলো। তারা জনগণের সমর্থন না নিয়েই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছে। তারা ভারতকে এদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ও ত্রাণকর্তা বলে ধারণা করেছে।

অপরপক্ষ মুসলিম জাতীয়তাবোধকেই এদেশের ভিত্তি ও স্থিতির নিয়ামক বলে বিশ্বাস করেছে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ এবং সমাজতন্ত্রকে ঐ সময়কার রাশিয়ার আদর্শ বলে মনে করেছে। তারা ভারতকে মুসলিম জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী বলে বিশ্বাস করে নি এবং তাদের সাহায্যে সত্যিকার স্বাধীনতা লাভ হবে বলেও ধারণা করে নি।

১৯৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর যে রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো তা আরও অনেক দলেরই ছিলো। মুসলিম লীগের সকল উপদল, জনাব নূরুল আমীনের পি.ডি.পি, নেযামে ইসলাম পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি ছাড়াও রাজনৈতিক দলের বাইরে মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও ছাত্র, মসজিদের ইমাম এবং ভারত বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন সবাই ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আনসার বাহিনীর মতো একটি বাহিনী টিক্কা খান সরকার গঠন করলো। এরই নাম দেওয়া হয় রেযাকার বাহিনী। সার্কেল অফিসারদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের সাহায্যে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে এ বাহিনীতে লোক ভর্তি করা হয়। এদেরকে দিয়ে পাহারার কাজই বেশি করানো হতো যাতে মুক্তিবাহিনীর লোকদের নাশকতামূলক কাজে বাধা দিতে পারে।

রেযাকার ফারসী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হলো স্বেচ্ছাসেবক বা ভলান্টিয়ার। এদের মধ্যে সব ধরনের লোকই ছিলো। এমন লোক ছিলো যারা সুযোগ পেলে হিন্দু বাড়িতে লুট করতো। বিভিন্ন স্থানে সম্পদ লোভী অন্য লোকেরাও হিন্দু সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে।

যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে মন্দ লোকেরা অনেক রকম জঘন্য আচরণ করারই সুযোগ গ্রহণ করে। '৭১-এ উপর্যুক্ত বহু রকম অমানবীয় কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হয়েছে যা চরম নিন্দনীয়।

সেনাবাহিনী ও রেযাকার বাহিনীর মধ্যে যারা বিভিন্ন ধরনের মানবতা বিরোধী কাজ করেছে এর কোনো একটার সাথেও জামায়াতের কোনো লোক জড়িত ছিলো বলে কেউ প্রমাণ করতে পারে নি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে জামায়াত ও অন্যান্য কতক দল বিচ্ছিন্নতার পক্ষে অবশ্যই ছিলো না। কিন্তু মানবীয় দিক দিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনো অবকাশই নেই।

১৯৭১-এর মানবীয় দিক

কোনো দেশে যখন সেনাবাহিনীকে জনগণের মধ্যে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন বিশেষ করে জওয়ানদের মধ্যে যারা চরিত্রহীন ও নৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল তারা নিরীহ মানুষের সাথে অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করে থাকে। '৭১-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিছু লোক এ জাতীয় আচরণ করার কারণেই জনগণ তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছে।

বিদ্রোহ দমনের নামে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকা শহরের বহু জায়গায় পাইকারী হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এরপর জেলা শহরগুলোতেও একই পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে প্রতিহত করা হয়েছে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে হিন্দু মহল্লায় হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে, বিশেষ করে যেসব স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিহারী বস্তিতে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছে সেসব স্থানে সেনাবাহিনীর আক্রমণ আরও তীব্র ছিলো।

আরও কিছুদিন পর যখন মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে রাতের বেলায় কোনো এলাকায় বোমা মেরেছে তখন পরদিন আশেপাশের বস্তি বা গ্রামে সেনাবাহিনী চরম যুলুম করেছে। মুক্তিবাহিনী তো রাতের মধ্যেই পালিয়ে গেছে। বস্তি ও গ্রামের লোকজন তো ঐ বোমার জন্য দোষী নয়। অথচ তাদের উপর নির্যাতন চালান হয়েছে এ অযুহাতে যে তারা মুক্তিবাহিনীকে কেনো আশ্রয় দিলো।

হত্যার চেয়েও যে কারণে জনগণ বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছে তা হলো নারী নির্যাতন। এর সংখ্যা কম বা বেশি হওয়া নিয়ে বিতর্ক চলে না। এটা এমন পশুত্বের আচরণ যা ক্ষমার অযোগ্য। এক শ্রেণির মানুষ এ ব্যাপারে পশুর চেয়ে অধম। বাংলাদেশে আজ নারী অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনা ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। এ দেশী নরপশুরাই এসব করছে। পাকিস্তানীদের মধ্যে যারা এ জাতীয় পশু ছিলো তারাও তা করেছে।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সালের মে

শেখ মুজিব সরকারের আজব সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান লাভ করার পর শেখ মুজিব সরকার দুটো আজব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

১. যারা '৭১-এ পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে কাজ করেছে তাদেরকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে 'কলাবরেটর্স এ্যাক্ট' নামে একটি আইন জারি করে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা।

২. তাদের মধ্যে যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি (বিদেশে থাকার কারণে বা দেশেই আত্মগোপন করে থাকায়) তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা।

এ দুটো কাজই ন্যাচারেল জাস্টিস ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিধি অনুযায়ী অত্যন্ত অন্যায় পদক্ষেপ ছিলো।

প্রথমত : 'কলাবরেটর্স এ্যাক্ট' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এটা বিশ্বে সর্বসম্মত বিধান যে, কোনো কার্যকলাপ সংঘটিত হবার পর ঐ কাজকে অপরাধ গণ্য করে সে জন্য শাস্তি দেবার আইন রচনা করা অবৈধ। আইন যদি কোনো কাজকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করে তাহলে ঐ কাজ করার জন্য উক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যে কাজ আইনত অপরাধ বলে গণ্য ছিলো না এমন কাজকে অপরাধ গণ্য করে পরবর্তীকালে আইন রচনা করা অন্যায়।

'৭১-এ যারা পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে কাজ করেছে তারা দেশের জন্য কল্যাণকর মনে করেই তা করেছে। ভারতের আধিপত্য থেকে দেশের স্বাধীন সত্তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই করেছে। দেশের কোনো আইন তারা অমান্য করে নি। সুতরাং তাদের এ কাজকে আইন ও নৈতিকতার বিচারে দূষণীয় বলা চলে না।

যারা বিচ্ছিন্নতার পক্ষে কাজ করেছেন তারাও দেশের কল্যাণ চিন্তা করেই তা করেছেন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এমন বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অস্বাভাবিক বা দূষণীয় নয়।

বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে অখণ্ড ভারতের মুসলমানগণ ভারত বিভক্ত করার পক্ষে এবং অমুসলিমগণ অখণ্ড ভারতের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। ভারত বিভক্ত হয়ে দুটো রাষ্ট্র কায়েম হবার পর দু' দেশের সরকার ভিন্ন মতের লোকদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচার করার চেষ্টা করে নি। পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর বিরোধী পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) কংগ্রেসী হিন্দু নেতারা প্রদেশে ও কেন্দ্রের আইন সভা ও মন্ত্রি সভার সদস্য ছিলেন। ভারত মুসলিম লীগকে এবং পাকিস্তান কংগ্রেস দলকে অবৈধ ঘোষণা করে নি এবং নেতাদেরকে গ্রেফতারও করে নি।

বাংলাদেশে যারা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলো তাদের দলসমূহকে বেআইনী ঘোষণা করেও সরকার স্বস্তিবোধ করে নি। তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক চাপে ঐ কালো আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় এবং মুখ রক্ষার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ অপরাধ বলে গণ্য হলেও তা মাফ করা হলো।

মজার ব্যাপার হলো, যে কাজটিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে এর আসল অপরাধী তো ছিলো পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। তাদেরকে যুদ্ধে বিজয়ী ভারতের হাতে তুলে দেবার পর যারা এ দেশের জন্মসূত্রে নাগরিক সে অসহায় লোকদেরকে শাস্তি দেবার জন্যই আইন তৈরি করা হলো এবং কিছুদিন পর সে অস্বাভাবিক আইন প্রত্যাহার করতে হলো।

দ্বিতীয়ত : জন্মসূত্রে নাগরিকদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। দেশের আইনে কোনো নাগরিক অপরাধী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পরে। কিন্তু নাগরিকত্ব হরণ করার কোনো এখতিয়ার সরকারের থাকতে পারে না। জন্মগত কারণে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দান। এটা বাতিল করার ক্ষমতা কারো থাকার কথা নয়। মুজিব সরকার এ আজব ক্ষমতা প্রয়োগ করে দাপট দেখানো প্রয়োজন মনে করেছেন।

যে অপরাধের দোহাই দিয়ে কতক লোককে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হলো সে অপরাধের নেতৃত্বে ছিলেন গভর্ণর ডা. মালেক ও তার মন্ত্রীসভা। তাদেরকে জেলে বন্দী করা হলো বটে। কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব বহালই রইলো। এ থেকে বোঝা গেলো যে, যাদেরকে গ্রেফতার করা গেলো না তাদেরকে শাস্তি দেবার আর কোনো উপায় আয়ত্বে না থাকায় ঐ আজব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ইতঃপূর্বে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিলো তারা তাদের নাগরিকত্ব বহাল করতে চাইলে সরাসরি স্বরাষ্ট্র সচিবের বরাবর আবেদন জানাতে পারেন। এ ঘোষণা এ কথারই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে, নাগরিকত্ব বাতিল করাটা অন্যায় সিদ্ধান্ত ছিলো। সে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সরকারের সম্মান রক্ষার্থে এ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। যে নির্দেশ বলে নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিলো তা প্রত্যাহার করে নিতে সরকারের ইজ্জতহানী হয় বলেই এ মুখরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

'৭৬-এর ঐ ঘোষণা অনুযায়ী যারা আবেদন পেশ করেছেন তাদের সবার নাগরিকত্বই বহাল হয়ে গেছে। অবশ্য প্রখ্যাত আইনবিদ জনাব হামীদুল হক চৌধুরীর নাগরিকত্ব বহাল করার আবেদন ছাড়াই তাদের সম্পত্তি উদ্ধারের এক মামলার মাধ্যমে তিনি নাগরিক বলে সাব্যস্ত হন। তিনি আমাকে আবেদন না জানাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করি নি। কারণ সরকার আমাকে দেশত্যাগ করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে আবেদন জানাতে হয়। ১৯৭৮ সালে আমার দেশে ফিরে আসার পর একে একে তিনটি সরকার আমার নাগরিক অধিকার বহাল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা তাদের রাজনৈতিক আতংকেরই প্রমাণ বহন করে। আমার রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করার হীন উদ্দেশ্য ছাড়া এর আর কোনো বৈধ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাপতির নিকট পাকিস্তানী সেনাপতির আত্মসমর্পণের পর থেকে ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বেআইনী থাকায় নিজস্ব নামে রাজনীতি করা সম্ভব ছিলো না। যেসব দল পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিলো সে সবই বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিলো। ১৯৭৬ সালে সরকারের অনুমতি নিয়ে দল গঠনের সুযোগ দেবার পরও জামায়াতের নামে অনুমতি না চেয়ে পি.ডি.পি ও নেযামে ইসলাম পার্টির সাথে মিলে আই.ডি.এল. (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) নামে একটি দল গঠন করা হয় এবং এ নামেই রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়।

তখনও আওয়ামীলীগ প্রণীত শাসনতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জাতীয় আদর্শ হিসেবে বিরাজ করছিলো এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিলো। তাই আই.ডি.এল.-এর রাজনৈতিক ভূমিকা তখন পর্যন্ত বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে নি। দেশের তৎকালীন সমস্যার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের সাথে সাথে জনগণের সামনে আই.ডি.এল-এর মঞ্চ থেকে

বলিষ্ঠভাবে একথা উচ্চারণ করা হয় যে, "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"। তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম এ উভয় মতবাদই ইসলাম বিরোধী।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আই.ডি.এল-এর নামে জামায়াতের ৬ জন এম.পি নির্বাচিত হন। ঐ বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহেই ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জামায়াতের রুকনদের সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী নিজস্ব নামে ৪-দফা স্থায়ী কর্মসূচিসহ প্রকাশ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তৎপরতা ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্তিমিত হয়ে যায় এবং প্রায় ৪ মাস পর ৭২-এর এপ্রিলেই পুনরায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়। ১৯৭৯-এর মে পর্যন্ত যারা রুকন হয়েছেন তাদের সম্মেলন স্বাভাবিক ভাবেই অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে।

আদর্শিক সংগঠন সাইনবোর্ডের ওপর নির্ভরশীল নয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপে সাইনবোর্ড অপরিহার্য। তাই জামায়াত ভিন্ন সাইনবোর্ডে রাজনীতি করার সাথে সাথে সাইনবোর্ড ছাড়াই সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে গেছে।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে তারিখে গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনী দ্বারাই জামায়াতের নামে প্রকাশ্যে তৎপরতা চালানোর পথে প্রধান বাধা দূর হয়ে যায়। কিন্তু আরও একটা বাধা অবশিষ্ট ছিলো। সরকারের নিকট দরখাস্ত করে দল গঠনের অনুমতি নেওয়ার বিধান তখনও ছিলো। ১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে ঐ বিধান বাতিল হবার পর পরই সংসদ নির্বাচনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ফলে আই.ডি.এল নামেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং নির্বাচনের তিন মাস পর '৭৯-এর মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বহাল হবার ঘোষণা দেয়।

১৯৭৯ সালের জুন থেকে ১৯৮২ সালের মার্চ

এ সময়ে জামায়াতে ইসলামী এর ৪ দফা কর্মসূচির মধ্যে ৪র্থ দফার চেয়ে প্রথম তিন দফার কাজেই বেশি মনোযোগ দেয়। ৪র্থ দফাটি হলো রাজনৈতিক তৎপরতার দফা। জাতীয় সংসদের ভেতরে আই.ডি.এল নামেই জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের কাজ চলতে থাকে। আর ময়দানে জামায়াতের নামে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।

১৯৮০-এর ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রীণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান জামায়াতের ম্যানিফেস্টোর সারসংক্ষেপ "৭-দফা দাবি" নামে ঘোষণা করেন। ৮০ সালেও জামায়াত সাংগঠনিক মযবুতি ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। জনসভায় উপর্যুক্ত ৭-দফা গণদাবিকে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়। এ সময় জামায়াত এমন কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা বা অভিযান পরিচালনা করে নি যা সরকারের সাথে সামান্য সংঘর্ষেরও নিমিত্ত হতে পারে।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারির ৮ ও ৯ তারিখে রমনা গ্রীণে ইসলামী ছাত্রশিবিরের জাতীয় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে ৯ তারিখে মাত্র ১৫ হাজার ছাত্রের একটি সুশৃঙ্খল মিছিল রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জামায়াত বিরোধী পত্রিকায়ও ৫০ হাজারের মিছিল বলে প্রচার করে কোনো কোনো মহলে আতংক সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়।

জামায়াতে ইসলামী তখন পর্যন্ত বড়ো আকারে কোনো কর্মী সম্মেলন বা সরকার বিরোধী কোনো রাজনৈতিক তৎপরতাও দেখায় নি। শক্তির প্রদর্শনী বলে গণ্য হবার মতো কোনো কাজই জামায়াত করে নি। কিন্তু ইসলামী ছাত্রশিবিরের মাত্র ১৫ হাজার কর্মীর সম্মেলন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অন্তরে রীতিমতো আতংকের সৃষ্টি করে দিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে যে দেশ কায়েম করা হলো সেখানে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হতে দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

ঐ ফেব্রুয়ারি মাসেরই ২০ তারিখের পত্রিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নির্বাচনের ভি.পি. ও জি.এস-সহ ২৬টি আসনের ২৩টিতে শিবিরের বিজয়ী

হবার সংবাদ ঐ মহলের কলিজায় আগুন ধরিয়ে দিলো। ঐ দিনই সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তদানীন্তন চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করলেন। ঘটনাক্রমে তখন চেয়ারম্যান ছিলেন কাজী কর্নেল নূরুজ্জামান আর সেক্রেটারি ছিলেন নঈম জাহাঙ্গীর যিনি জিয়া হত্যার পর আসামী হিসেবে পলাতক ছিলেন। তারা দু'জনই মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও নির্দেশ দিলেন যেনো সারা দেশে জামায়াত কোথাও জনসভা বা প্রকাশ্যে কর্মী সভাও করতে না পারে।

বিস্ময়ের বিষয় যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও ২৪ মার্চ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জামায়াতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন। এর ফলে সারা দেশেই জামায়াতের সমাবেশ ও মিছিলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু হলো। জামায়াত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে ঐ পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ এড়াবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য কর্মসূচি মুলতবী রাখে।

মাত্র দু' মাস পর ৩০ মে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়া সেনাবাহিনীর লোকদের হাতে নিহত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা নেতাদের আত্মগোপনের ফলে জামায়াত বিরোধী তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

জিয়া হত্যার পর জামায়াত প্রচার-প্রচারণা, বিবৃতি ও জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকে। একই ব্যক্তির রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সরকার দলীয় প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনী প্রধান থাকলে স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষমতার পরিবর্তন হতে পারে না। শেখ মুজিব এবং জিয়াউর রহমান যে অস্বাভাবিক পন্থায় ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এমনটা ভবিষ্যতে কিছুতেই যাতে না ঘটে সেজন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি প্রণয়ন করে ২২টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিলো যে, সব দলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তবে কেউ অগ্রসর হন নি। আমাদের দেশে এটা একটা কুপ্রথা চালু আছে যে, কোনো দলের পক্ষ থেকে কল্যাণের কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও তা অন্য কোনো বিশিষ্ট দল গ্রহণ করেন না। কারণ এতে প্রস্তাবক দলের প্রাধান্য সৃষ্টির আশঙ্কা নাকি থাকে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সেনাপতির ক্ষমতা দখল

যা হোক, ১৯৮১ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যে উপনির্বাচন হয় তাতে জামায়াতে ইসলামী বি.এন.পি. প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তারকেই সমর্থন করে। বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি আওয়ামীলীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ নির্বাচনে দু'জন নিহত নেতার মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নির্বাচনী পোস্টারে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের ফটো বিরাট আকারে এবং ড. কামাল ও বিচারপতির ছবি নীচে ছোটো আকারে শোভা পাচ্ছিলো। ঐ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও উঠে নি। তাই নির্বাচনে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো যে, শেখ মুজিবের প্রতি জনগণের কোনো আকর্ষণ বা আবেগ অবশিষ্ট নেই।

বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মধ্যে স্বৈরশাসক হবার যোগ্যতা বা আগ্রহ ছিলো না। শেরেবাংলার শিষ্য এবং বিচারপতি হিসেবেও তার মধ্যে গণতন্ত্র বিরোধী মানসিকতা হয়তো ছিলো না। কিন্তু জনগণের বিপুল সমর্থনে বিজয়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মধ্যে যে দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন ছিলো তার অভাবে তিনি জেনারেল এরশাদের অন্যায় দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করে দেশকে চরম স্বৈরতন্ত্রের পথে ঠেলে দিলেন।

জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে যে কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তা বিচারপতির জানা নাও থাকতে পারে। প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রকাশ্যে নির্বাচিত সংসদ ও মন্ত্রিসভার মাধ্যমে দেশ শাসন করলেও পর্দার অন্তরালে সশস্ত্র বাহিনীর একটি কাউন্সিল তাঁর প্রচ্ছন্ন ইনার কেবিনেট হিসেবে কাজ করতো। সেখানে সিদ্ধান্ত না নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই মন্ত্রিসভা বা সংসদে উত্থাপিত হতো না। এমন কি মন্ত্রী বাছাই করার ব্যাপারেও ইনার কেবিনেটে মতামত নেওয়া হতো। জেনারেল এরশাদ এবং অন্যান্য যারা ইনার কেবিনেটে ছিলেন তারা নির্বাচনের পর বিচারপতির নিকট থেকে ঐ জাতীয় কোনো সুযোগ না পাওয়ায় সংকট সৃষ্টি হয়।

বিচারপতি সাত্তার নির্বাচনের পর একজন গণতান্ত্রিক নেতা ও দলীয় প্রধান হিসেবে স্বাভাবিক নিয়মে মন্ত্রিসভা গঠন করে দেশ শাসন করা শুরু করলেন। জেনারেল এরশাদ নজীরবিহীন পদ্ধতিতে দেশ শাসনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশীদারিত্বের দাবি তুললেন। তারা যেহেতু জিয়ার আমলে অংশীদার ছিলেন সেহেতু গোটা সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থন এরশাদ সাহেবের পক্ষে থাকাই স্বাভাবিক ছিলো। এমনকি তিনি প্রেস-কনফারেন্স পর্যন্ত করে বললেন এবং তার দাবি

বলিষ্ঠভাবে পেশ করলেন। অসহায় বিচারপতি তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানদের সমন্বয়ে একটি "ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল" গঠন করেন। দেশের শাসনতন্ত্রে এর কোনো বিধান নেই। প্রশ্ন উঠলো যে এ কাউন্সিল কি জাতীয় সংসদের চেয়েও শক্তিশালী?

জেনারেল এরশাদ এ কাউন্সিলে মন্ত্রী ও বেসামরিক সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এতে শরীক হতে অস্বীকার করলেন এবং সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নিলেন। চতুর এরশাদ নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে নিজের ইচ্ছায় ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেবার জন্য বাধ্য করতে সক্ষম হলেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রয়োজনীয় সৎ সাহসটুকুও দেখাতে পারলেন না। সাংবাদিক সম্মেলন করে এরশাদ যে অপরাধ করেছেন এবং শাসন ক্ষমতায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশদারীত্ব দাবি করে তিনি যে সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন সে দোষের কারণে প্রেসিডেন্ট সাত্তার এরশাদকে বরখাস্ত করতে পারতেন। এতোটা সৎসাহস না থাকুক অন্তত নিজের ইচ্ছায় এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার কাপুরুষতা না দেখালে ভোট দাতাদের ও তার নিজের সম্মান কিছুটা হলেও রক্ষা পেতো।

এটা অত্যন্ত দুঃখ, লজ্জা ও কলংকের বিষয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সরকার দলীয় প্রধান এবং সশস্ত্রবাহিনী প্রধানের পদ তার দখলে থাকা সত্ত্বেও তিনি এরশাদের চরম অন্যায়ের নিকট এমন অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। টেলিভিশন ও রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর নিজের গঠিত মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ গেয়ে তিনি স্বেচ্ছায় সেনাপতি এরশাদের হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দেবার কথা ঘোষণা করলেন। ফলে সেনাপতি এরশাদ এ ভণিতা দেখাবার সুযোগ পেলেন যে, তিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করেন নি। দেশকে দুর্নীতি থেকে উদ্ধার করার জন্য মেহেরবানী করে এ গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি সত্যিই যোগ্য অভিনেতার মতো "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা" করেই ক্ষমতার আসন গ্রহণ করেন।

বিচারপতি সাত্তার যদি অন্তত চুপ করেও থাকতেন তাহলেও তাঁর ও জনগণের ইযযত কিছুটা রক্ষা হতো। সে অবস্থায় তাকে গৃহবন্দী হতে হতো মাত্র। আর কোনো ক্ষতি হতো না। তাহলে তাঁর মন্ত্রীদের ওপর এরশাদ যে যুলুম করেছেন তা থেকে তারা কিছুটা রেহাই পেতেন। পরবর্তীতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে শাহ আজীজুর রহমানের নেতৃত্বে বি.এন.পি. কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও এম.পি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন যে, একমাত্র আপনারাই এরশাদ সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার যে দাবি আমরা তুলেছি তা আপনারা সমর্থন করলে দাবিটি আরো জোরদার হয়। আমি অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বললাম যে, এ কাপুরুষ যদি নিজের ইচ্ছায় ক্ষমতা এরশাদের হাতে তুলে না দিতেন তাহলে আজ লক্ষ লক্ষ জনতার মিছিলের পুরোভাগে তাকে রেখে বঙ্গভবন পুনর্দখলের আন্দোলন করা যেতো। নির্বাচনে তাঁকে আমরা সমর্থন করায় তাঁর ঐ দুর্বল আচরণে আমরা চরম লজ্জাবোধ করছি।

১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর

প্রেসিডেন্টের স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে জেনারেল এরশাদ সশস্ত্র বাহিনীর মহান নেতার নৈতিক মর্যাদা বহাল রেখেই ক্ষমতা হাতে নিলেন। শাসনতন্ত্র মুলতবী, জাতীয় সংসদ বাতিল ও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করে পূর্ণ দাপটের সাথে তিনি সামরিক শাসন ঘোষণা করলেন ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান সামরিক প্রশাসক এরশাদ ঘোষণা করলেন যে, ১ এপ্রিল থেকে রাজনৈতিক দলসমূহ 'ঘরোয়া' রাজনীতি করতে পারবে। অর্থাৎ ঘরের বৈঠকাদি করা ও সামরিক আইনের সীমালঙ্ঘন না করে পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

কিন্তু জেনারেল এরশাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি এমন এক রাজনৈতিক বালসুলভ আবেগ প্রকাশ করে বসলেন যে সাথে সাথে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো এবং রাজনৈতিক বিবৃতি প্রদান শুরু হয়ে গেলো। জমিয়াতুল মুদাররিসীনের এক বিরাট সম্মেলনে হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি আবেগ তাড়িত হয়ে ইসলামের মহানেতার ভূমিকায় অভিনয় করে বসলেন। তিনি এমন তিনটি ঘোষণা দিলেন যা ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহলের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলো :

১. তিনি ঘোষণা করলেন যে, তার সরকার বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

২. আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কুরআনখানি ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী তরীকায় শহীদ দিবস পালন করা হবে এবং অনৈসলামী কোনো কার্যকলাপ সেখানে হতে দেওয়া হবে না।

৩. আর্ট কলেজের অধ্যাপক ঢাকাস্থ রুশ দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে মক্কার সাথে মস্কোর তুলনা করার খবর পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও আপনারা জিহাদের ডাক দিলেন না। আমি কি একা জিহাদ করবো? আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি আপনাদের সাথে আছি।

পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সব দৈনিক পত্রিকায় বড়ো বড়ো হেডিং-এ এসব বিপ্লবী ঘোষণার বিবরণ প্রকাশিত হলো। ঐ দিন আওয়ামীলীগসহ বামপন্থীদের ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয়ে গেলো। সাধারণত রাজনৈতিক দলসমূহের জোট গঠন করতে বহু লবির দরকার হয় বলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপারেই মনে করা হয়। কিন্তু ১৫টি দলের বিরাট জোট হঠাৎ একদিনের মধ্যেই কেমন করে গঠন করা সম্ভব হলো? এর গোটা কৃতিত্ব জেনারেল এরশাদের প্রাপ্য। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক বহু দল ভেঙে টুকরা টুকরা করে নিজ দল গড়ে দুর্ণাম কুড়িয়েছেন। এরশাদ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ব্যবস্থা করে সুনাম কামাই করলেন।

১৫ দলীয় জোটের পনেরো জন সভাপতি ও সচিবের যুক্ত স্বাক্ষরে ঐ দিনই এরশাদের ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদে এক বিরাট ও বিদ্রোহাত্মক বিবৃতি পত্রিকার অফিসে পৌছলো। [একটি দৈনিক পত্রিকার অফিস থেকে] ঐ বিবৃতিটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিলো। ঐ বিবৃতির কোনো কথাই পরদিনের পত্রিকায় প্রকাশ পায় নি। কারণ বিবৃতিটির প্রতিটি কথাই সামরিক আইনের আওতায় পড়ে। এ বিবৃতি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকসহ কর্তাদের নযরে নিশ্চয়ই পড়েছিলো। কিন্তু সামরিক আইনের চরম বিরোধী বিবৃতি দেবার জন্য সরকার সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করার সাহসও পায় নি। পত্রিকাওয়ালারা আইনের ভয়ে ছাপে নি। কিন্তু এ বিবৃতি দাতারা বুঝতে পারলেন যে, এরশাদ কাগুজে বাঘ মাত্র।

এরশাদের ঐসব বালখিল্য ঘোষণা দেশের ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো কল্যাণই করে নি। তার তিন দফা ঘোষণার কোনটাই তিনি বাস্তবায়িত করার সামান্য উদ্যোগও নেন নি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঐবার আগের চেয়ে বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ঐসব ইসলাম বিরোধী অনুষ্ঠানই হলো যা করতে দেওয়া হবে না বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন। মক্কার সাথে মস্কোর তুলনা করার বিরুদ্ধে জিহাদ করার দায়িত্ব মাদ্রাসা শিক্ষকদের হাতে দিয়ে এরশাদ সাহেব নিশ্চিন্ত হয়ে নিরব রইলেন। আর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যা করা দরকার তার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ হলেন।

জেনারেল এরশাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার ফলে ১ এপ্রিলের আগেই ঘরোয়া রাজনীতি ও বিবৃতি শুরু হয়ে গেলো। ১৫ দলীয় জোট দাবি জানালো যে, সরকার যেন দেশের শাসনতন্ত্রকে তৃতীয় সংশোধনী পর্যন্ত বহাল রেখে পুনরুজ্জীবিত করেন। এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তারা চান যে, ৫ম সংশোধনী উঠে যাক ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র আবার শাসনতন্ত্রে বহাল হোক। আর একদল দাবি করলো যে, '৭২-এর প্রণীত শাসনতন্ত্র এর প্রথম আকৃতিতেই

বহাল হোক এবং পরবর্তী সব সংশোধনী বাতিল হয়ে যাক। এভাবে বিভিন্ন রকম দাবি ও প্রস্তাব পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকলো।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐসব দাবিতে অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং রাজনৈতিক দলসমূহকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে চিন্তা করতে ব্যর্থ হতে দেখে হতাশাবোধ করে। ঐসব দাবির মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক একনায়কের হাতে শাসনতন্ত্রের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলে পরিবর্তন আনার অধিকার তুলে দেবার প্রস্তাব কেমন করে করতে পারলেন তা ভেবে জামায়াত পেরেশান হয়ে গেলো।

দেশের রাজনীতি সচেতন মহলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে জামায়াতের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১ এপ্রিল থেকে যে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হবার কথা এর প্রাক্কালে ২৮ মার্চ সারা দেশে একই সাথে মুদ্রিত আকারে ঐ বিজ্ঞপ্তিটি বিলি করা হলো। ২৮ মার্চ বিলিকৃত বিজ্ঞপ্তিটি পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের শিরোনাম পেলো এবং এর বক্তব্যও প্রকাশিত হলো। কোনো বিজ্ঞপ্তির খবর জাতীয় পত্রিকায় খবর হিসেবে প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা। বিজ্ঞপ্তিটির বক্তব্যের গুরুত্বই এ মর্যাদা পাওয়ার কারণ।

ঐ বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য নিম্নরূপ :

"শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত পবিত্র দলিল এবং দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশক মৌলিক আইন। দেশের পার্লামেন্ট, প্রশাসন ও সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত শাসনতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

"এ শাসনতন্ত্র কারো খাম-খেয়ালের দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য নয়। এর সংশোধনের পদ্ধতি শাসনতন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে। এ পর্যন্ত যে কয়টি সংশোধনী হয়েছে তা ঐ পদ্ধতি অনুযায়ীই হয়েছে। এসব সংশোধনী সকল দলের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও তা অস্বীকার করার অধিকার কারো নেই। অবশ্য শাসনতন্ত্রে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী যে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করার অধিকার সবারই আছে।

বর্তমানে সামরিক শাসনের কারণে শাসনতন্ত্র মূলতবী অবস্থায় আছে। সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে শাসনতন্ত্র আবার চালু হবে। তখন শাসনতন্ত্রে দেওয়া পদ্ধতিতে প্রয়োজন হলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হবে। কিন্তু শাসনতন্ত্র সামান্য কোনো রদবদলের ক্ষমতাও সামরিক সরকারের নেই। তাই শাসনতন্ত্র যে

অবস্থায় মুলতবী হয়েছে সে অবস্থায়ই বহাল করতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন জোট ও দল যেসব দাবি তুলেছেন তা মোটেই যথার্থ নয়।"

রাজনৈতিক মহল এ সুস্পষ্ট বক্তব্য অবহিত হবার পর এ বিষয়ে কেউ তাদের দাবি পুনরায় ব্যক্ত করেন নি। ১৯৮৩ সালের রমযান মাসে (ইংরেজি মাসের নাম মনে নেই) ইডেন হোটেলে ১৫ দলীয় জোটের কর্মী সম্মেলনেও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাদের পূর্ব দাবি আর উত্থাপন করা হয় নি। উক্ত সম্মেলনের পর জনাব আবদুস সামাদ আযাদ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি বলেন :

"১৪ ফেব্রুয়ারি মাওলানা আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্মেলনে এরশাদের বক্তৃতার পর আমাদের সবার এ ধারণাই ছিলো যে, আপনারাও এরশাদের সাথে আছেন। এরশাদের নেতৃত্বে সব রাজাকাররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মনে করেই ১৫ দলীয় জোট সৃষ্ট হয়েছে একে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। ১৫ ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া ১৫ দলীয় বিবৃতির বক্তব্য এরশাদ-রাজাকার আঁতাতের বিরুদ্ধেই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিলো।

কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞপ্তি মারফতে যে বক্তব্য পাওয়া গেলো তাতে আমাদের ভুল ভেঙে গেছে। বোঝা গেলো আপনারা এরশাদের সাথে নেই।"

আমি শাসনতন্ত্রে এরশাদকে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে না দেবার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, "আপনাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে আমরা ১৫ দলীয় জোট পূর্ব দাবি আর উত্থাপন করছি না। ইডেন হোটেলের কর্মী সম্মেলনে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনো কথা না বলে অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে।"

আমি বললাম যে, সামরিক শাসন জারি করার পূর্বে এরশাদের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ পর্যন্ত তিনি যতো বক্তব্য দিয়েছেন তাতে শাসনতান্ত্রিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কায়েম করাই তার লক্ষ্য। ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ তিনি অনুসরণ করতে চান। তাই শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করাই তার প্রয়োজন। এ সুযোগ কিছুতেই তাকে দেওয়া যাবে না। সামাদ সাহেবও এ বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে বিদায় নিলেন।

জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনাতেই জামায়াতে ইসলামী ঐ ঐতিহাসিক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দান করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এটাই প্রথম মাইল ফলক। এ দ্বারা শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এরশাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলো।

১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ চত্বরে জামায়াতের বিশাল জনসভায় ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ঘোষণা করেন যে, "জেনারেল এরশাদের সরকার অবৈধ। শাসনতন্ত্রের হেফাজত করার শপথ নিয়ে তিনি সেনাপতির পদ গ্রহণ করেছেন। ঐ শাসনতন্ত্র মুলতবী করে ক্ষমতা দখল করে তিনি শপথ ভঙ্গের অপরাধ করেছেন। তাই তার নিকট অন্য কোনো দাবি নয়। শুধু এ দাবি জানাচ্ছি যে, যেখান থেকে এসে তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন সেখানেই ফিরে যান। দেশ শাসনের কোনো অধিকার তার নেই।"

এ জনসভায় আরো একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করা হয়। জনাব আব্বাস আলী খান সাহেব বলেন যে, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁকে ব্যারাকে ফিরে যাবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। প্রধান বিচারপতি একটি "কেয়ারটেকার সরকার" হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ সরকারের পক্ষেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে। দেশকে শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য আর কোনো বিকল্পই থাকতে পারে না। এ পদ্ধতি মেনে না নিলে স্বৈরশাসনের অবসান হতে পারে না। এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হলে স্বৈরশাসন আরো স্থায়ী হবারই আশঙ্কা।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন

১৫ ও ৭ দলীয় জোটের যৌথ উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও করে এরশাদের পদত্যাগ দাবি করা হয়। জোটদ্বয়ের সিদ্ধান্ত ছাড়াই কোনো একটি মহল সচিবালয়ের প্রাচীর ভাঙার অজুহাতে আবার সামরিক শাসন কঠোর করা হয় এবং প্রকাশ্যে রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। উভয় জোটের নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার এড়াবার জন্য আত্মোগোপন করেন।

আত্মগোপন অবস্থায় থাকাকালে শাহ আজীজুর রহমানের পক্ষ থেকে একজন প্রাক্তন উপমন্ত্রী আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন। আমি বললাম যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গণতন্ত্র বহালের আন্দোলনে আমি বিশ্বাসী। সন্ত্রাসী পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে পারে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে হলে গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বরং গ্রেফতার হবার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের পালিয়ে থাকা মানায় না।

জামায়াতে ইসলামী তীব্রভাবে অনুভব করলো যে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করা ছাড়া সফলতার কোনো সম্ভাবনা নেই। রাজনৈতিক জোট ও দলের নেতৃবৃন্দের সাথে এ বিষয়ে

যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে ৫ সদস্যের একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়। দু' জোট নেত্রীসহ উল্লেখযোগ্য দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে কমিটি একনিষ্ঠভাবে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে থাকে। নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একমত হন যে, সন্ত্রাসী কার্যাবলি থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রক্ষা করতে হবে।

১৯৮৪ সনের জানুয়ারি থেকে আবার আন্দোলন জোরদার হয়। এ সময় থেকে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী লিয়াজো কমিটির উদ্যোগে যোগাযোগ করে যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে থাকে এবং একমঞ্চে না গিয়েও সমঝোতার ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যায়। এভাবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কেয়ারটেকার সরকার

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪-তে জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোকে তাঁর সাথে সংলাপের জন্য আহ্বান জানান। ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী সংলাপে যায় নি। ছোট ছোট ৫৩টি দল সংলাপে সাড়া দেয়। সঙ্গত কারণেই ঐ সংলাপ নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। এরশাদ সাহেব মে মাসে উপজেলা চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন করিয়ে প্রতি থানায় তাঁর নির্ভরযোগ্য এজেন্ট যোগাড় করার পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান করে বেসামরিক সরকার কায়েমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

মার্চ '৮৪-তে জেনারেল এরশাদ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের পর দেশে ফেরার প্রাক্কালে আমেরিকায়ই ঘোষণা দেন যে, মে মাসে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে। পত্রিকায় এ খবর প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে এরশাদ দেশে ফিরবার পূর্বেই জামায়াত দাবি জানায় যে, জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পূর্বে আর কোনো নির্বাচন হতে পারে না।

উভয় জোট এ দাবির পক্ষে সোচ্চার হন। উপজেলা নির্বাচনের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে জেনারেল এরশাদ প্রথমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়ে জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করতে চেয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই ১৫ ও ৭ দলীয় জোট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো যে, জাতীয় সংসদের নির্বাচনই প্রথমে হতে হবে এবং এর আগে আর কোনো নির্বাচন করা হলে তা প্রতিহত করা হবে। একথাও ঘোষণা করা হলো যে, উপজেলা নির্বাচন বাতিল করা না হলে এরশাদের সাথে কেউ সংলাপেও বসতে রাযী নয়।

মার্চ মাসে যুগপৎ আন্দোলন জোরদার হলে এরশাদ এপ্রিলের শুরুতেই উপজেলা নির্বাচন মুলতবী ঘোষণা করে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীকে সংলাপের আমন্ত্রণ জানায়। সবাই এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। জামায়াত ও ৭ দলীয় জোটকে ১০ এপ্রিল এবং ১৫ দলীয় জোটকে পরের দিন সংলাপে বসার সময় নির্দষ্টি করা হয়।

জামায়াতে ইসলামী তীব্রভাবে অনুভব করলো যে, এ সংলাপকে সফল করতে হলে ১৫+৭+১=২৩ দলকে এক সাথেই এরশাদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে এবং সবার পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে একই দাবি পেশ করতে হবে যাতে তা মেনে নিতে এরশাদ বাধ্য হন। পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা হলে এরশাদ দু' জোট ও জামায়াতের মধ্যে মতপার্থক্য আবিষ্কার করার সুযোগ পাবেন এবং সংলাপ ব্যর্থ হবার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকেই দোষী সাব্যস্ত করে নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

এ উপলব্ধির কারণেই জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি দুই জোট নেত্রীর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলে একজন এক সাথে যাবার পক্ষে এবং আর একজন বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তখন জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হলো যে পৃথক পৃথকভাবে সংলাপে গিয়েও যদি সবাই একই দাবি জানায় তাহলে একত্রে যাবার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। তখন উভয়েই বক্তব্যের খসড়া চেয়ে বললেন যে, মনে হয় একক বক্তব্য সম্পর্কে আপনারা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। আপনারা লিখিত আকারে বক্তব্যের খসড়া প্রস্তাব দিলে আমরা জোটের সামনে তা পেশ করবো। জামায়াত যে খসড়া পেশ করলো এর সারকথা নিম্নরূপ :

"জেনারেল এরশাদ! আপনি অবৈধ উপায়ে দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন। আপনার দেশ শাসন করার শাসনতান্ত্রিক ও নৈতিক কোনো অধিকার নেই। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের সরকার কায়েম করে গনতন্ত্রকে বহাল করাই আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য।"

"আপনার ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন কিছুতেই আশা করা যায় না। তাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আপনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। প্রধান বিচারপতি একটি কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ সরকারের পরিচালনায় জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জনপ্রতিনিধিগণ শাসনতন্ত্র মোতাবেক ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। আপনি নিজস্ব দল নিয়ে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে আপনার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে আমরা আপনার সরকারকে বৈধ বলে মেনে নেবো।

"আপনাকে আমরা এ সুযোগও দিতে প্রস্তুত যে, ইচ্ছা করলে আপনিই কেয়ারটেকার সরকারের ভূমিকা পালন করতে পারেন। যদি আপনি কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করতে চান তাহলে আপনাকে ঘোষণা করতে হবে যে, আপনার কোনো রাজনৈতিক দল নেই এবং নির্বাচনে আপনি কোনো প্রার্থী দাঁড় করাবেন না। আপনাকে প্রথমেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নির্বাচনের পর সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেবেন।"

জামায়াতের পক্ষ থেকে উভয় জোটকে বলা হয় যে, এরশাদের পদত্যাগ ও কেয়ারটেকার সরকার গঠনের দাবিকে একমাত্র জাতীয় দাবি হিসেবে ২৩ দল যদি এক সাথে সংলাপ পেশ করে তাহলে এ দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া এরশাদের কোনো পথ থাকবে না। যদি আলাদাভাবে সংলাপে যাওয়া হয় তাহলে তার কাছ থেকে কোনো কমিটমেন্ট আদায় করা সম্ভব হবে না। এরশাদ টালবাহানা করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। তিনি এক জোটের কথা শোনার পর কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বলবেন যে আপনাদের কথা শুনলাম। অন্যদের বক্তব্য শোনার পূর্বে আপনাদেরকে কী করে সিদ্ধান্ত দিতে পারি। তাই একসাথে দাবি আদায় করার সংকল্প নিয়ে ২৩ দলের সম্মিলিতভাবে সংলাপে যোগদান করা উচিত।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কোনো জোটই ঐ খসড়া গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করতে সক্ষম হলো না এবং এক সাথে সংলাপে যেতেও সম্মত হলো না। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, প্রধান জাতীয় ইস্যুকে গুরুত্ব না দিয়ে সংলাপে যাবার জন্য প্রধান দুটো দল নিজস্ব দলীয় ছোট ছোট দাবি আদায় করে নিলো। তাছাড়া ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে সংলাপে যাবার শর্ত হিসেবে এমন একটি দাবিও পেশ করলো যা চরম অমানবীয় বেআইনি। ১১ মার্চ ১৫ দলের কয়েকটির সাথে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৪ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সামরিক আদালত অপরাধীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়ে এরশাদের অনুমোদনের জন্য পাঠায়। এ শাস্তি মওকুফ না করলে ১৫ দলীয় জোট সংলাপে বসবে না বলে হুমকি দেয়। এরশাদ তাঁরই গঠিত সামরিক আদালতের রায়কে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নাকচ করে সন্ত্রাসের রাজনীতিকে উৎসাহিত করলেন।

ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের ডেলিগেশন জেনারেল এরশাদের সাথে ১০ এপ্রিল আলোচনা শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসে সংলাপে পেশকৃত বক্তব্যের লিখিত কপি সাংবাদিকদের নিকট বিলি করেন এবং তাদের প্রশ্নাবলির জবাব দেন। জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকারের

দাবি ছাড়া আর কোনো ইস্যুকেই সংলাপের সময় উত্থাপন করা হয় নি। ১৭ এপ্রিল যখন পুনরায় জেনারেল এরশাদের সাথে জামায়াতের ডেলিগেশনের সাক্ষাত হয় তখন এরশাদ সাহেব কিছুটা বিরক্তির সাথে মন্তব্য করলেন যে, শুধু আপনারাই কেয়ারটেকার সরকারের দাবি জানালেন। ১৫ ও ৭ দলের কেউ তো এ দাবি উত্থাপন করে নি।

এভাবে পৃথক পৃথক সংলাপের মাধ্যমে এরশাদ সাহেবের চাল সফল হলো এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে ব্যর্থ হয়ে গেলো। ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের অপরিকল্পিত সংলাপ কোনো সুফল বয়ে আনতে পারলো না। ১৫ দিন ব্যাপী অর্থহীন সংলাপের পর ২৯ এপ্রিল জেনারেল এরশাদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে তৃপ্তির সাথে জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশন ও রেডিওতে দেওয়া ভাষণে বলেন যে, "গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তারা একমত হয়ে কোনো মতামত দিতে পারলেন না। এক এক জোট ও দল এক এক রকম কথা বলে। আমি কার কথা গ্রহণ করবো? তাদের দাবিতে আমি উপজেলা নির্বাচন মূলতবী রেখেছিলাম। তারা যখন আমাকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো পরামর্শ দিতে পারলেন না তখন আমাকে বাধ্য হয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।"

১৫ ও ৭ দলীয় জোট জামায়াতের পরামর্শ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং যুগপৎভাবে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে কোনো সমন্বিত ও সর্বসম্মত দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম না হওয়ায় জেনারেল এরশাদের গদী আরও মযবুত হয়ে গেলো। তিনি দাপটের সাথেই উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠান করলেন।

বিনা বাধায় উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করার পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণাও এলো। জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচন হতে দেব না বলে ফাঁকা হুমকিও দেওয়া হলো। কিন্তু বাস্তবে নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত থাকা ছাড়া বিরোধী জোট ও দলের পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব হলো না।

উপজেলা নির্বাচনে চরম কারচুপি ও সন্ত্রাসে এ ধারণা স্পষ্ট হয় যে, জেনারেল এরশাদের পরিচালনায় কোনো নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এর পরই ১৫ ও ৭ দলীয় জোট 'কেয়ারটেকার ' পরিভাষা ব্যবহার না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্দলীয় সরকার কায়েমের দাবি উচ্চারণ করতে থাকে। অথচ ১৯৮৪-এর এপ্রিল সংলাপের সময় একথা তারা বলতে পারলেন না।

এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ২য় অবদান

১৯৮৩ সালের এপ্রিলে এক বিজ্ঞপ্তি মারফতে মুলতবী শাসনতন্ত্র পুনর্বহালের সময় সামরিক শাসনকর্তার হাতে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ইখতিয়ার প্রয়োগের অধিকার তুলে দেবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো জামায়াত একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তা প্রতিহত করা হলো প্রথম অবদান।

দ্বিতীয় অবদান হলো নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় জাতীয় ও স্থানীয় সব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

অবশ্য দ্বিতীয় অবদানটি কার্যকর করতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে দুটো জোট ১৯৯০ সালের অক্টোবরের পূর্বে ফর্মূলাটি সমর্থন করতে ব্যর্থ হওয়ায় স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত হলো। তারা যখন কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে সোচ্চার হলেন তখন তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ দাবির পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ফলে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কোনো দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী না হওয়ায় বি.এন.পি-কে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে জামায়াত সমর্থন দেয়। জামায়াত ইচ্ছা করলে বি.এন.পি'র সাথে কোয়ালিশন সরকারে শরীক হয়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারতো।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির উদ্ভাবক ও প্রস্তাবক জামায়াতে ইসলামী। রাজনৈতিক অঙ্গনে একথা অস্বীকার করার সাহস কারো নেই। পরবর্তী সময়ে একটি দল এর কৃতিত্ব দাবি করে হাস্যাস্পদ হয়েছে, এ দাবির স্বীকৃতি কেউ দেয় নি। এ পদ্ধতির কারণেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় গিয়ে মেয়াদ শেষে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

বাংলাদেশে জামায়াতের নামে প্রথম নির্বাচন

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে আওয়ামীলীগ সরকার যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তাতে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করে। এর ফলে সব ইসলামী দল বেআইনী বলে গণ্য হয়।

১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আইনগত বাধা দূর হলেও জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৯-এর মে মাসের পূর্বে প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু

করেনি। তাই ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াত নিজস্ব নামে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। ঐ নির্বাচনে আই. ডি. এল নামে মুসলিম লীগ ও নেযামে ইসলাম পার্টির সাথে মিলে জামায়াত ৬টি আসনে বিজয়ী হয়।

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াত প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করলে সব ধর্মনিরপেক্ষবাদী দল দাবি করে যে, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী নামে কোনো দলের রাজনীতি করার অধিকার নেই। তারা জামায়াতের রাজনৈতিক তৎপরতায় বাধা দিতে থাকে।

কোনো দল যদি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচন কমিশন যদি ঐ দলকে কোনো প্রতীক বরাদ্দ করে তাহলে সে দলটি আইনগতভাবে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃত বলে গণ্য হয়। যদি সংসদের কিছু আসনে নির্বাচিত হয় তাহলে পূর্ণ স্বীকৃতি পায়। আর যদি কমপক্ষে ১০টি আসনে বিজয়ী হয় তাহলে পার্লামেন্টারি পার্টির মর্যাদা লাভ করে। জামায়াত এ আইনগত স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যেই ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং আল্লাহর রহমতে ১০টি আসনে বিজয়ী হয়ে সংসদে পার্লামেন্টারি মর্যাদা হাসিল করতে সক্ষম হয়।

জামায়াত নিজস্ব ইস্যু ছাড়া অন্য দলের ইস্যুতে কখনো আন্দোলন করে নি

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে এমন কখনো হয় নি যে, অন্য কোনো দল কোনো ইস্যু নিয়ে ময়দানে আন্দোলন করছে, আর জামায়াত তাদের সমর্থনে আন্দোলনে যোগদান করেছে।

এ কথাটি এজন্য বলতে হচ্ছে যে, জামায়াত ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বি.এন.পি ও আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক ছিলো। ১৯৯৪ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সাথে কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে আন্দোলনে সক্রিয় ছিলো। আবার ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বি.এন.পি, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টির সাথে ৪ দলীয় ঐক্যজোটে শামিল হয়ে আন্দোলন করেছে।

জামায়াতের নিন্দুকরা অপপ্রচার চালায় যে, জামায়াত একবার এক দলের সাথে, আবার অন্য দলের সাথে মিলে আন্দোলন করে। একবার যে দলের সাথে মিলে আন্দোলন করে, আর একবার ঐ দলের বিরুদ্ধেই অন্য দলের সাথে মিলে আন্দোলন করে।

নিন্দুকদের এ অপপ্রচার অযৌক্তিক। দেখতে হবে যে, জামায়াত নীতিভ্রষ্ট হয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের বশবর্তী হয়ে কোনো আন্দোলনে শরীক হয়েছে কি-না।

জামায়াত আইয়ুব খানের আমলে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আরো চারটি দলের সাথে এক প্লাটফর্মে শামিল হয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছে। ১৯৯৯ সালে ৪ দলীয় জোটে এক প্লাটফর্মে যোগদান করেই আন্দোলন করেছে।

জামায়াত অন্য দলের সাথে এক প্লাটফর্মেই আন্দোলন করুক বা বিভিন্ন দলের সাথে যুগপৎ আন্দোলনই করুক সকল আন্দোলনেই জামায়াতের নিজস্ব ইস্যুর ভিত্তিতেই আন্দোলন করেছে। কোনো সময় অন্য দলের সাথে কমন ইস্যুতে আন্দোলন করেছে। কোনো সময় জামায়াতের ইস্যুতে অন্যদল শামিল হয়েছে। যেমন কেয়ারটেকার ইস্যু জামায়াতের প্রস্তাবনা অন্যরা তা মেনে নিয়েছে।

১৯৯১ থেকে ২০০৫

জামায়াতের বিরুদ্ধে নারী নেতৃত্ব সমর্থনের অভিযোগ

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর জামায়াত বি.এন.পি-কে সরকার গঠনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সমর্থন দেয়। নিন্দুকেরা প্রচার চালায় যে জামায়াত ইসলামের দোহাই দেয়, অথচ নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে।

১৯৯১, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালের তিনটি নির্বাচনে শতকরা ৮০ জন ভোটার দু' নেত্রীর দলকে ভোট দিয়েছে। বি.এন.পি ও আওয়ামী লীগের পুরুষ নেতারা নিজ নিজ দলের সভাপতির দায়িত্ব মহিলার উপর অর্পণ করেছে। জনগণের শতকরা আশিজনও দু' দলকে ভোট দিয়েছে। দল দুটো জনগণকে নারী নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। এর জন্য কি জামায়াতকে দায়ী করা সঙ্গত?

১৯৯১ সালে যদি জামায়াত সরকার গঠনে বি.এন.পি-কে সমর্থন না দিতো তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়তো এবং সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে যেতো। তখন নিন্দুকেরা এর জন্য আবার জামায়াতকেই দোষী সাব্যস্ত করতো।

জামায়াত যদি নিজের দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব কোনো মহিলার ওপর অর্পণ করতো তাহলেই শুধু নারী নেতৃত্ব মানার দোষে জামায়াতকে দোষারোপ করা সঠিক হতো। জামায়াতের সংগঠনের সর্বস্তরে মহিলা বিভাগের নেতৃত্বের দায়িত্ব মহিলারাই পালন করেন। কিন্তু নারী ও পুরুষের মিলিত দায়িত্ব কোনো স্তরেই কোনো মহিলার ওপর অর্পণ করা হয় না।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানসহ কোনো পদেই আসীন হওয়া নিষেধ নয়। তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্রও নয়। তাই এদেশে পুরুষই প্রধানমন্ত্রী হোক, আর নারীই হোক তা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হলে প্রধানমন্ত্রী পুরুষই হবে। নারী ও পুরুষের মিলিত সংগঠনের ইসলাম অনুযায়ী নেতৃত্বের দায়িত্ব পুরুষের ওপরই থাকা স্বাভাবিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোনো নারীকে নবী-রাসূল নিযুক্ত করেন নি। তাই বাংলদেশে নারী নেতৃত্বের জন্য জামায়াতকে দায়ী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

জোট সরকারে জামায়াতের শামিল হওয়া

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ সংগঠনে একটা চমৎকার ঐতিহ্য কায়েম করে গেছেন যা এখন পূর্ণরূপে চালু আছে। জামায়াতের রুকনদের ভোটে নির্বাচিত মজলিসে শুরাই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। অন্যান্য রাজনৈতিক দলে কাউন্সিলের যে মর্যাদা, জামায়াতে ইসলামীতে মজলিসে শুরা সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

মাওলানা মওদূদী এ ঐতিহ্য কায়েম করেছেন যে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজলিসে শূরার সর্বসম্মত রায়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শূরায় মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে শূরার নির্বাচকদের (রুকনদের) সম্মেলনে ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঐ ঐতিহ্যের গুরুত্ব জামায়াত অনুভব করে। রাসূল সা. বলেছেন, "আমার উম্মত কোনো ভুল সিদ্ধান্তে একমত হবে না।" তাই যদি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে সিদ্ধান্তকারীগণ কোনো বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে মতামত ব্যক্ত করার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে আশা করা যায়, ঐ সিদ্ধান্ত নির্ভুল হবে।

এ বিষয়ে এখানে এজন্য আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করলাম যে, জামায়াতের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিন্দুকেরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায়। যেমন ১৯৯১ সালে জামায়াত বি.এন.পি-র সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলো না, অথচ ২০০১ সালে ঐ বি.এন.পি.-র সাথেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলো। আগে কেনো মন্ত্রীত্ব নিলো না, পরে কেনো নিলো? আমাকে কেউ কেউ বলেছেন ১৯৯১ সালে মন্ত্রীত্ব না নিয়ে আপনারা বিরাট ভুল করেছেন। মন্ত্রীত্ব নিলে আপনার নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যেতো। যিনি একথা বলেছেন তাঁকে আমি হিতাকাঙ্ক্ষীই মনে করি। যে কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে জামায়াত সর্বসম্মতভাবেই ১৯৯১ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে নি; কিন্তু ২০০১ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে। ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক উপরোক্ত উভয় সিদ্ধান্তই জামায়াত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছে। তাই এ দুটো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাংগঠনিক পর্যায়ে জামায়াতে কোনো বিতর্ক নেই।

১৯৯১ সালে জামায়াত জোটভুক্ত না হয়ে এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। কোনো দলের সাথে মন্ত্রীসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি। বিরোধী দলে থাকাই সমীচীন মনে করেছে। বি.এন.পি এককভাবে সরকার গঠন

করতে অক্ষম হওয়ায় নিতান্ত গণতন্ত্রের স্বার্থে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সরকার গঠনে সাহায্য করেছ। তা না হলে চমৎকার একটি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিলো।

জামায়াতের ঐ সিদ্ধান্তে প্রায় সবাই বিস্মিত হয়েছে। জামায়াত দর কষাকষি করলে কমপক্ষে তিন/চারটি মন্ত্রীত্ব পেতো। কেউ কেউ ঐ সিদ্ধান্তকে বোকামীও মনে করে থাকবে। কারণ মন্ত্রীত্ব পাওয়ার এমন সঙ্গত সুযোগ গ্রহণ না করাটা অস্বাভাবিকই বটে। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এমন নিঃস্বার্থতা বিরল। ২০০১ সালের সিদ্ধান্তের পটভূমি ভিন্ন।

১৯৯৬ সালের অক্টোবর থেকে শেখ হাসিনা সরকারের চরম দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯৯৯ সালে যখন চার দলীয় জোট গঠিত হয় তখন সব দলই তীব্রভাবে অনুভব করে যে ঢিলেঢালা ধরনের ঐক্য বা যুগপৎ মার্কা আন্দোলন মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই চারটি দল এক প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে নির্বাচন ও সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সিদ্ধান্তের কারণেই জামায়াত মন্ত্রীসভায় যোগদান করে। জামায়াতের মজলিসে শূরা সর্বসম্মতভাবেই এ চুক্তিতে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জামায়াত অনিয়মতান্ত্রিক পন্থাকে ইসলামী মনে করে না

জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, নবী-রসূলগণ ইকামাতে দীনের আন্দোলনে চিরন্তন নেতা। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ইসলামকে বিজীয় করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাই তাঁদের নিকট ইসলামী জীবন বিধান পাঠিয়েছেন এবং এ বিধানকে কায়েম করার পদ্ধতি তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন। তাই যারাই ইসলামী আন্দোলন করতে চায় তাদেরকে নবীদের পদ্ধতিতেই আন্দোলন ও সংগ্রাম করতে হবে।

নবীগণ বিশেষ করে সবচেয়ে সফল, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সা.-এর পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তিনি দীনের দাওয়াত জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পূর্বে ১৩ বছরের মক্কী জীবনে অপপ্রচার, অপবাদ, যুলুম, নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি অনিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসমূলক কোনো সামান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নি। তার বিরুদ্ধে চরম সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলা সত্ত্বেও মক্কী জীবনে সাহাবায়ে কিরামকে প্রতিরোধের অনুমতিও দেন নি। তিনি মক্কার সংগ্রাম যুগে বিরোধীদের সর্বপ্রকার বাড়াবাড়িকে নিরবে সহ্য করেছেন।

কিন্তু মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবার পর এ ক্ষুদ্র নতুন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যখন হামলা করা হলো, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশেই জনবল ও অস্ত্রবলে বিরোধীদের তুলনায় অনেক কম শক্তি নিয়েই মোকাবিলা করে আল্লাহর সরাসরি সাহায্যে দুশমনদেরকে প্রতিহত করলেন।

জামায়াতে ইসলামী রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কী যুগের পলিসি অনুযায়ীই সন্ত্রাসের শিকার হয়েও বিরোধীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না।

জামায়াতের বিরোধী মহল জামায়াতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের যতো অপবাদ দিয়েছে সবই ডাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে যতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে এর প্রতিটির জন্যই শেখ হাসিনা বিনা তদন্তে জামায়াতকে দায়ী করেছেন। কিন্তু কোনো একটি ঘটনার সাথে জামায়াত পরোক্ষভাবেও জড়িত বলে প্রমাণিত হয় নি।

সম্প্রতি (২০০৫ সাল) বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় কাদিয়ানীদের আস্তানায় সন্ত্রাসী হামলার জন্য ইসলাম বিরোধী পত্র পত্রিকা জামায়াতকে দায়ী করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার জন্য পরাশক্তি আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে এরই জের ধরে বাংলাদেশেও ইসলামী জঙ্গীবাদ আবিষ্কারের ষড়যন্ত্র চলছে এবং জামায়াতকেও জঙ্গীবাদী বলে অপবাদ দিচ্ছে। যেসব পত্রিকায় এ জাতীয় অপবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে তারা জামায়াতের পক্ষ থেকে দেওয়া কোনো প্রতিবাদ প্রকাশ না করে তাদের পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

একবিংশ শতাব্দিতে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মসূচি

১. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার জন্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই তথাকথিত "ইসলামী জঙ্গীবাদী ও মৌলবাদী" শক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে গোটা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। ইসলামকে জঙ্গীবাদী মতাদর্শ হিসেবে অপবাদ দেবার উদ্দেশ্যে হীন প্রচেষ্টা চলছে। এর আঘাত সরাসরি জামায়াতের উপরও পড়ছে। কারণ জামায়াত তো ইসলামী আদর্শেরই পতাকাবাহী। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে এ প্রচারাভিযানের বিরুদ্ধে ইসলামকে সঠিক রূপে পরিবেশন করে এবং বাস্তব ময়দানে তৎপরতা দ্বারা জামায়াত ঐ অপবাদের বলিষ্ঠ মোকাবিলা করছে।

২. বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যারা খড়গহস্ত তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। তারা ভারত থেকে আমদানী করা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এ দেশে চালু করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে। ভারতের যেসব দাবি বর্তমান (২০০৫) জোট সরকার মেনে নিচ্ছে না সেসবই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পূরণ করবে বলে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন। শেখ মুজিবের কুশাসন ও শেখ হাসিনার দুঃশাসন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাঁর ফ্যাসিবাদী ভূমিকা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আওয়ামীলীগ গণতন্ত্রেরও দুশমন।

ইসলাম, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশকে ভারতের আধিপত্য থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আওয়ামীলীগ যাতে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সে উদ্দেশ্যে জামায়াত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য মনে করে। দেশ, জাতি ও দীনের স্বার্থে এ বিরাট কর্তব্য জামায়াতের একার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয় বলেই আওয়ামীলীগ বিরোধী জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করছে।

৩. জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সর্বস্তরের নাগরিকদের নিকট বাংলা ভাষায় পরিবেশন করছে। সৎ ও যোগ্য লোকের একটি বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ দেশের অমুসলিম নাগরিকদের নিকট ইসলামী শাসনের সুফল সম্পর্কে ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা করেছে। সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমদের সমঅধিকার নিশ্চিত বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। ইসলামী শাসনে সকল মানুষই শোষণ, অবিচার, বৈষম্য থেকে মুক্তি পায় বলে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। সব ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি স্বয়ং কুরআনই দিয়েছে বলে তাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে।

ইসলামী ঐক্যের জন্য জামায়াতের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

জামায়াতে ইসলামী সবসময়ই এটা উপলব্ধি করেছে যে, বাংলাদেশে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে। কিন্তু সেসব শক্তি যথাযথ সংগঠিত নয়। যে কয়টি সংগঠন রয়েছে তাদের মধ্যেও ঐক্য না থাকায় ইসলামী শক্তি রাজনৈতিক ময়দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৯ সাল থেকে ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৮১ সালে "ইত্তেহাদুল উম্মাহ" নামে একটি ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ গঠিত হলেও সব ইসলামী মহল তাতে শরীক না হওয়ায় ঐক্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি।

ঐক্য প্রচেষ্টা সন্তোষজনকভাবে সফল না হলেও ১৯৮০-এর দশকে ইসলামী খিলাফত ও শাসনতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে নতুন কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করেছে। এতে আলেম সমাজে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সত্ত্বেও এখনও বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ আলেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইসলামী রাজনীতির সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি।

জামায়াতে ইসলামী ইসলামী শক্তিগুলোর ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেই কোনো ইসলামী দল জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেও জামায়াতের পক্ষ থেকে পাল্টা বক্তব্য দেওয়া হয় না। কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাইলে জামায়াত এড়িয়ে চলে। যেসব দল ইসলামী পরিচয় বহন করে তাদেরকে জামায়াত প্রকৃত বিরোধী হিসেবে গণ্য করে না। তাই তাদের বিরোধিতার মোকাবিলা করা জামায়াত সমীচীন মনে করে না। ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকেই জামায়াত, বিরোধী শক্তি হিসেবে গণ্য করে। জ্ঞান, চরিত্র ও সহনশীলতা দিয়ে জামায়াত তাদের মোকাবিলা করে। তাদের বাড়াবাড়ির জবাবেও জামায়াত পাল্টা বাড়াবাড়ি করে না। জামায়াত তো কখনো কোনো দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেই না।

সমাপ্ত

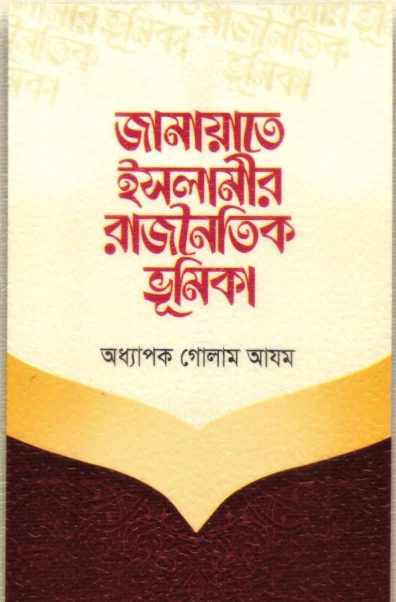

আধুনিক প্রকাশনী

২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.adhunikprokashoni.com
adhunikprokashani@gmail.com
adhunikprokashoni

978-984-99187-6-9